অধ্যায় - ১: জাতি, বৃত্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, সংস্কার, শিল্প ও শিল্পী:

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। মধ্যযুগের বাণীতীর্থে তিনি অন্যতম। শুধু সমাজ নয়, কবির কাব্যে আছে ইতিহাসবোধ। স্বর্গের সিঁড়ি কিন্তু স্বর্গ নয়। বরং স্বর্গ থেকে জীবন অনুরাগী মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনি শুনিয়েছেন তিনি বাঙালিকে। মঙ্গলকাব্যের উদাসীন অনুদারতার মধ্যে তিনি মর্ত্য পৃথিবীকে প্রাণবান করেছেন তাঁর সুবিপুল মানবতাবোধ দিয়ে। পরিণত শিল্পজ্ঞান, জীবনকে উপভোগ করার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিকে মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে অমরতা দিয়েছে। তাঁর সৃষ্টিতেই কালের পালাবদল স্তরে স্তরে উপস্থিত। তাঁর সৃষ্টিতেই সামাজিক পর্বান্তর বহুকৌণিক মাত্রাবোধে উপস্থিত। আরণ্যক সভ্যতা সবে মাত্র জনপদে পরিণত হচ্ছে। অরণ্য নির্ভর অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের বেঁচে বর্তে থাকার ইতিহাস চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধরা পড়েছে। আর্য-অনার্যের সংঘাত সমন্বয়, হিন্দু সমাজের শ্রেণীকরণ, বর্ণভেদ-জাতিভেদ, বিশ্বাস-সংস্কার, লোক-লৌকিকতা, ভাঙা-গড়ার বিপুল অধ্যায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধরা পড়েছে। জাতি-বৃত্তি-সম্প্রদায়-শিল্পী ও শিল্পের দেবভূমি তাঁর কাব্য। আরণ্যক সভ্যতার প্রত্নলক্ষণ পরবর্তী কৃষিভিত্তিক সমাজের নানা স্তর, যা লোকশিল্প সৃষ্টির আদর্শভূমি হিসেবে বিবেচিত, সেই উর্বর সমাজদেহকে ধারণ করেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। লোকশিল্প, জীবন-যাপনের অপরিহার্য উপকরণ – মুকুন্দরামের কাব্য এমন শিল্পে টইটুম্বুর। প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের অপরূপ সমাহার যে লোকশিল্প, তাকে অনন্য করে তুলেছেন কবি তাঁর কাব্যে। এককথায়, সমাজ এবং শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের আতুড়ঘর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। লোকশিল্পের মহাকাব্য – বাঙালির রামায়ণ গান মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দরাম শহরের কবি নন, শিশিরে ভেজা ঘাস, নারকেল বীথি, ধানক্ষেত, বাবলা কাঁটার উপর ঢলে পড়া সূর্য, খাল-বিল-নদী-নালা, আরণ্যক প্রতিভাস একই সঙ্গে মূর্ত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। সেকালের বাংলাদেশের জাতিতত্ত্বের ধারাবাহিক বিন্যাস ও অনুসন্ধান তাঁর কাব্যকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। আর্য-অনার্যের সংঘাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বোপরি লোকশিল্পের উৎসমুখ চিহ্নিত হয়েছে তার

কাব্যে। লোকশিল্পের প্রধান স্থপতি যে সাধারণ ব্রাত্য বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়, কবির সমগ্র কাব্য জুড়ে রয়েছে তাদের সশব্দ পদচারণা।

তাঁর কাব্য নানা নিম্নবর্গীয় বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় ও শিল্পীর তীর্থক্ষেত্র। তাঁদের সৃষ্ট শিল্পই কাব্যের প্রাণ। তাঁর কাব্যে হিন্দু শিল্পী সম্প্রদায়ের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি আছে মুসলমান বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়। ষোড়শ শতকের পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশে স্পশ্য-অস্পৃশ্য বোধ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য শাসিত বাংলাদেশে জাতিগত বাতাবরণে কর্ম ও বর্ণবিভাগ একই সূত্রে সম্পৃক্ত হয়েছিল। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতিটি পল্লী ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্য সূত্রে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই বৃত্তি গ্রহণ করেছে এক এক জাতি, সম্প্রদায়। আদিম সাম্যবস্থা পরবর্তী ব্রাত্য জীবনের অংশীদার হতে হতে সত্য সত্যই ব্রাত্য অস্পৃশ্য হয়ে গেছে মুছি-মেথর, চামার-ছুতোর প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় লোকায়ত মানুষজন। শ্বাপদ-সংকুল পরিবেশ গাছ-গাছালি জঙ্গলপূর্ণ অরণ্য অংশকে পরিষ্কৃত করে প্রজা বসতি হয়েছে। জঙ্গল কাটাই অপাংক্তেয়, ব্রাত্যজন রূপে থেকে গেছে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চোখ রাঙানি জীবনকে থামিয়ে রাখতে পারে নি। কৃষিভিত্তিক সমাজে বর্ণ এবং কর্মবিভাগ স্পষ্ট হয়ে যায়। V. Gordon Childe তাঁর 'Social Evolution' গ্রন্থে লিখেছেন – "Obviously the cultivation of edible plants, the breeding of animals for food, or the combination of both pursuits in mixed farming, did represent a revolutionary advance in human economy. It permitted a substantial expansion of population. It made possible and even necessary the production of a social surplus. It provided at least the germs of capital". [১]

বাংলাদেশে এই পর্বেই লোকশিল্প সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছে। এই যুগ মধ্যযুগ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আরণ্যক ভূভাগ পরিষ্কার করে প্রজাবসতি হয়েছে। নানা বৃত্তি এবং সম্প্রদায়ের মানুষ গুজরাট নগরে বসতি স্থাপন করেছেন। একটি বিদ্ধিবদ্ধ নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে নতুন উপাদান সংগ্রহ করে নব কলেবর প্রাপ্ত্ হয়েছে নতুন জনপদ। অবশ্য সমাজ গঠনে জাতি-

সম্প্রদায়-বৃত্তি ও শিল্পের মূল কাঠামো একই। মহাভারতে খাণ্ডব দহন করে, অরণ্য ধ্বংস করে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ করেছিলেন। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্য পরিষ্কার করে গড়ে উঠেছিল জনপদ। তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরে সাঁওতালেরা জঙ্গল পরিষ্কার করে গড়ে তুলেছিল বসতি। আর কালকেতু আরণ্যক ভূভাগকে প্রজাবসতির উপযোগী করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নানা বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের আনাগোনা। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এসেছে 'কাগতি'। অর্থাৎ যারা কাগজ তৈরি করে জীবিকা অর্জন করেন। এসেছে 'পটুয়া'। পটুয়ারা পট তৈরি করে জীবিকা অর্জন করেন। এসেছেন 'পিঠাহারী' সম্প্রদায় । পিঠাহারী মুসলমানদের এক বিশেষ বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়। হারিয়ে যাওয়া এই সম্প্রদায়ের শিল্পীদের চণ্ডীমঙ্গলের পাতা ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিঠা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এরা। এসেছেন 'জোলা'। মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়কে 'জোলা' বলা হয়। তাঁতে কাপড় বুনে এই শিল্পীরা জীবিকা অর্জন করতেন। এছাড়া এসেছেন 'সানাকর'। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এই শিল্পীরা তাঁতে সুতো পরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, সানা নির্মাণ করেন। সানা তাঁতের অপরিহার্য অংশ। আর এক হারিয়ে যাওয়া বৃত্তিজীবী মুসলমান সম্প্রদায়, যারা বাণ বা তীর নির্মাণ করেন, তারা হলেন 'তিরকর'। কালকেতুর নগর পত্তনে তাদের জায়গা দিয়েছেন কবি। এছাড়া কাব্যে এসেছে 'মুগরী' নামের বিশেষ মুসলমান সম্প্রদায়। গোরুর পিঠে ধান বয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এই সম্প্রদায়ের মানুষ। মুসলমান মৎস্য বিক্রেতা সম্প্রদায়কেও ভোলেন নি কবি। এই সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা সমাজে 'কাবাড়ি' নামেই পরিচিত। আর আছে যাযাবর ফকির সম্প্রদায়। যারা সেকালের লোকসমাজে কলন্দর নামে অভিহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠিন নাগপাশে জাতিভেদ জর্জরিত বাংলাদেশ। তবু কর্মমুখর লোকসম্প্রদায়ের জীবনশক্তিতে হ্রাস করতে পারে নি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়। এই বাংলাদেশেও ব্রাহ্মণ্যেরাই ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক। হিন্দু সমাজে তারা অভিশপ্ত জাতিভেদ প্রথার জন্ম দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এক অভিশাপ। অবশ্য চক্রবর্তী কবি মুকুন্দরাম ছিলেন আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা- ' The Hindoos As They Are: A description of the manners, customs and inner life of Hindoo society in Bengal' গ্রন্থে

S.C. Bose (Shib Chandra Bose)- হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথাকে 'Abnormal System' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন – "The Hindoo Shastras do not agree as to this point, but is obvious to conclude that is must have originated in a dark age when a proud and selfish priesthood, in the exercise of its sacerdotal functions, imposed on the people this galling yoke of religious and social servitude". [২]

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্ভুত বাংলাদেশে জাতিভেদ প্রথাও প্রান্তিক লোকায়ত মানুষের অপরাজেয় জীবনাশক্তিকে পরাভূত করতে পারে নি। জাতিভেদ ছিল কিন্তু কর্মমুখরতাকে হ্রাস করতে পারেনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়। বৃত্তিজীবী মানুষ প্রয়োজন অনুসারী শিল্প সৃষ্টি করেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে লোকশিল্প। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দু বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের অজস্র শিল্পের উল্লেখ আছে। এককথায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হয়ে উঠেছে লোকশিল্পের ভাণ্ডার ঘর।

[নিম্নে উল্লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [৩]

হিন্দু বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মিছিল ধরা পড়েছে কবির কাব্যে। মুসলমান জেলেদের মত হিন্দু তন্তুবায় (তাঁতি, পৃ: ৭৯, পৃ: ৮২) সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে কাব্যে। তেলি (৩ বার উল্লিখিত, পৃ: ৭৯, পৃ: ৮১, পৃ: ২৬) সম্প্রদায়ের উল্লেখ বেশ কয়েকবার এসেছে। তেলি ঘানিতে তেল মেড়ে জীবিকা অর্জন করেন। অনেকবারই কাব্যে কামার সম্প্রদায়ের (পৃ: ৮১, ২ বার উল্লিখিত) উল্লেখ এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কামারের উল্লেখও করেছেন কবি। এছাড়া কুমোর (পৃ: ৮৫), গোপ (পৃ: ২৬, পৃ: ৭৯, পৃ: ৮১), ঘটক ব্রাহ্মণ (পৃ: ৭৯), সন্ন্যাসী (পৃ: ৮০), বৈদ্য (চিকিৎসক, পৃ: ৮০), গ্রহবিপ্র (জ্যোতিষ,পৃ: ৮০), লবনিঞা (লবন প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়, পৃ: ২৬), তামুলি (পৃ: ৩২), মালাকার (মালা প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়, পৃ: ৪৭), চামরী (চামর প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়, পৃ: ৪৭), এবং শিঙ্গাদারের (শিঙ্গাবাদক) উল্লেখ এসেছে কাব্যে। এই সমস্ত বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ সকলেই লোকশিল্পী ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু ছিলেন লোকশিল্পের পৃষ্ঠপোষক, বাহক, রক্ষক। এদের মধ্যে অনেক বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় লোকশিল্প সৃষ্টির কাজে সোজাসুজি নিয়োজিত ছিলেন।

এছাড়া হলিক (চাষা,পৃ: ৮১), কুম্ভকার (কুমোর,পৃ: ৮২), তাম্বুলি (তামলি, পান প্রস্তুতকারক, পৃ: ৮১), মালী (পৃ: ৮২), বারুই (বোরজ নির্মাণকারী শিল্পী, পৃ: ৮২), নাপিত (পৃ: ২৯), আঘরি (আগুরি, উগ্রধর্মাবলম্বী হিন্দু জাতি, উগ্রক্ষত্রিয়), মোদক (মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী ময়রা সম্প্রদায়, পৃ: ৮২), গন্ধবাণ্যা (গন্ধবণিক,পৃ: ৮২), শঙ্খ ব্যান্যা (শঙ্খ বণিক, পৃ: ৮২), মণিবান্যা (জুহুরি, যারা মণি-মুক্তোর অলংকার তৈরি করেন), সরাক (জৈন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি, নিরামিশ ভোজী জৈন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, যারা পাট শাড়ী তৈরির বৃত্তি গ্রহণ করেন (পৃ: ৮২) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। একালে এসব বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে কাঁসারি (যারা কাঁসার বাসন-কোসন তৈরি করে জীবিকা অর্জন করেন, পৃ: ৮২), সাঁপুড়া (পৃ: ৮২), সুবর্ণবণিক (পৃ: ৮২), পশ্যতোহর (স্বর্ণকার,পৃ: ৮২), পল্লব-গোপ (গোয়ালা জাতি বিশেষ, পৃ: ৮২), ধীবর-কৈবর্ত (পৃ: ৮২), কলু(পৃ: ৮২), বাইতি (বাদ্যকর, নানা বাদ্যযন্ত্র বাজানো সম্প্রদায়, পৃ: ৮২), সৌগন (সুঁড়ি,পৃ: ৮২), নড়ি (সম্প্রদায়, যারা নানা বর্ণের অলংকৃত চুড়ি তৈরি করেন, পৃ: ৮২), বাগদি (জাল বোনা, মাছ ধরা এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সম্প্রদায়, পৃ: ৮২), পাইক (পদাতিক সৈন্য, পৃ: ৮২), কোঁচ (হিন্দু সংকর জাতি বিশেষ, পৃ: ৮২), কামানিঞা (কামান প্রস্তুতকারী, পৃ: ৯১) প্রভৃতি বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

অরণ্য কেটে গ্রাম (নগর) পত্তনের সাথে সাথে প্রজাবসতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই কাব্যে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়ের আগমন। সামাজিক শৃঙ্খলা এবং চলমান জীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে বৃত্তি অনুসারী লোকশিল্প গড়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেই লোকশিল্পীকুল পৃথক স্বাতন্ত্র্য রেখে গেছে। কাব্যে এসেছে দরজি (যারা কাপড় কেটে জামা-প্যান্ট তৈরি করেন, পৃ: ৮৩), শিউলি(যারা খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন, পৃ: ৮৩), ছুতার (যারা কাঠের কাজ করেন, এছাড়া এরা চিড়া কুটা এবং মুড়ি ভাজার কাজ করেন, পৃ: ৮৩), পটুয়া (হিন্দু পট শিল্পী বা চিত্র নির্মাতা সম্প্রদায়, পৃ: ৮৩), চৌদুলি (হিন্দু চৌদোল বাহক বিশেষ জাতি, পৃ: ৮৩), চুনারি (যারা শামুক বা ঝিনুক পুড়িয়ে চুন প্রস্তুত করেন, পৃ: ৮৩), কোরঙ্গা (যারা বাজি তৈরি করেন, পৃ: ৮৩), চামার (যারা চামড়া দিয়ে শিল্প তৈরি করেন, পৃ:

৮৩), ডোম (যারা বাঁশ বেতের ঝুড়ি ছাতা প্রভৃতি শিল্প তৈরি করেন, পৃ: ৮৩), ময়রা (মিষ্টি তৈরি সম্প্রদায়, পৃ: ৮৩) প্রভৃতি লোকশিল্পীরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিশেষ জায়গা নিয়েছে।

সোজাসুজি শিল্প কর্মের সঙ্গে যুক্ত না হলেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত অনেক সম্প্রদায় এসেছে যারা সমাজ-স্বাস্থ্যকে প্রাণবান করেছে এবং শিল্পের পরিপোষক ও রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লোকশিল্পের ব্যবহার ও সঞ্চালকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন এই ব্রাত্য সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদের মধ্যে আখেটিক খণ্ডে উল্লিখিত লোকসম্প্রদায়গুলি হল – ধোবা (পৃ: ৮৩), পাটনি (মাঝি,পৃ: ৮৩), চণ্ডাল (লবন, পানিফল এবং বিশেষ জাতীয় গাছের মূল বা ঘাস বিক্রেতা, নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়, পৃ: ৮৩), কিরাত (হাটে ঢোল বাজানোর কাজ করেন এমন সম্প্রদায়, পৃ: ৮৩), কেয়লা (নট জাতি যারা, পৃ: ৮৩, 'গোয়ালিয়া গান' গায়) সম্প্রদায়ের শিল্পীরা গোরু সম্বন্ধীয় গান করে জীবিকা অর্জন করেন। সুঁড়ি (শুড়ি, যারা মদ তৈরি এবং বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন, পৃ: ৮৩), হাড়ি (নিম্নবর্গীয় হিন্দু জাতি যারা মল মূত্র পরিষ্কার করেন, পৃ: ৮৩), ঢালি (ঢালযুক্ত বা ফলকধারী বা ঢালধারী যোদ্ধা সম্প্রদায়, পৃ: ৮৯), ধানুকী (ধনুকধারী যোদ্ধা সম্প্রদায়, পৃ: ৮৯) প্রভৃতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অখেটিক খণ্ডে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলি বাংলাদেশের জাতি-বৃত্তি এবং শিল্পের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ হয়ে উঠেছে। সমাজ গঠনে উপরিউক্ত বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

বণিকখণ্ডে ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য বর্ণনার ইতিবৃত্তই প্রধান। বাণিজ্য বিনিময়, শিল্প বিনিময়, সপত্নী কলহ, দেবী চণ্ডীর পূজা লাভই এই অংশের উপজীব্য বিষয়। এই খণ্ডেও নানা বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ স্বমহিমায় বিচরণ করেছেন। এই প্রান্তিক মানুষের লোকশিল্প সমাজদেহকে প্রাণবন্ত করেছে। যে সব সম্প্রদায় এবং শিল্পীদের বিচরণ বণিকখণ্ডে লক্ষ করা যাচ্ছে, তারা হলেন – মালাকার (২ বার উল্লিখিত, পৃ: ১৩১), কামিলা (কারুশিল্পী, এই শিল্পীরা সুবর্ণ পিঞ্জর তৈরি করেছেন,পৃ: ১৩০), কুমার (২ বার উল্লিখিত, পৃ: ২০৪, পৃ: ২৮৮), গদী (গদাধারী সম্প্রদায়, পৃ: ২৭০), ঢালী (৩ বার উল্লিখিত, পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭১, পৃ: ২৭২), পাইক (৪ বার উল্লিখিত, পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭১, পৃ: ২৭২), তবকী (বন্দুকধারী সৈন্য, ৫ বার উল্লিখিত, পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭২, পৃ: ২৭৩, পৃ: ২৭৩, পৃ: ২৭৪), ধানকী (ধনুর্ধারী যোদ্ধা সম্প্রদায়, ২ বার উল্লিখিত,

পৃ: ২৭০, পৃ: ২৭৫), ঢুলি (ঢোল বাজানো সম্প্রদায়, ২ বার উল্লিখিত, পৃ: ২৭৬), বাদিয়া (পৃ: ৩১০) প্রভৃতি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নানা সম্প্রদায় এবং শ্রেণী চরিত্রের চিত্রমালা। জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন মুকুন্দরাম। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চলমান সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন কবি। ব্যক্তিক জীবন অভিজ্ঞতা কবির সৃষ্টিকে শক্তি দিয়েছে। সমাজের ক্রমবিকাশের পৃথক দুই ধারা চণ্ডীমঙ্গলের দুই আখ্যানের অন্তরালে নিহিত। আখেটিক খণ্ডে, আরণ্যক ব্যাধেদের সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত এবং সমাজনিষ্ঠ সংস্কৃতায়নের ছবি ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ বণিকখণ্ডে উচ্চস্তরীয় বণিক সমাজের চিত্রলেখা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। বাস্তবরসের কবি মুকুন্দরাম শ্রেণী চরিত্র নির্মাণে মধ্যযুগের স্রষ্টাদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জীবনের গতিশীল ছন্দ এবং লোকশিল্পের উৎস ও বিকাশের মর্মস্পন্দন তিনি কাব্যে চিত্রিত করেছেন। তাঁর শিল্পবোধ নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল। মুকুন্দরামের কাব্যে উল্লিখিত অজস্র সম্প্রদায় ও শ্রেণী লোকশিল্পের পোষক ও রক্ষক রূপে উঠে এসেছেন। কাব্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীর মানুষজন হলেন – শিকারজীবী (আক্ষটী, আহিড়ি, আহিড়ী), কাপড়ী (যোগী ভিখারী, সন্ন্যাসী বিশেষ), কাবাড়ি(মুসলমান শ্রেণীবিশেষ), কিতাপী (পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ), কামানিয়া(গোলন্দাজ বাহিনী বিশেষ), কারফরমা (ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজকর্মচারী), কোয়ালি (মুসলমান শ্রেণীবিশেষ), গাঠ্যার বা গাবর (গাঁট বাঁধার নাবিক শ্রেণী), গারড়, গরুড়ী (সর্পবৈদ্য), ঘটক, গ্রামণ্য (গ্রামভারি ব্যক্তি, গ্রামের নেতা, গ্রামণী), জবন, ঠুঠা, ঠুটা (যারা বাঁদর খেলায়), ডিহিদার (গ্রামগুচ্ছের শাসন কর্তা), দেঘর‍্যা(দেবমন্দিরে নিযুক্ত পূজারি), দেয়াসিন (লৌকিক দেব-দেবীর ভারপ্রাপ্ত পূজারিণী)। নিউগী (নিয়োগী, রাজা নিযুক্তের পদবী), নুন্যা (লবন ব্যবসায়ী), কোটালিয়া (অধস্তন রাজ কর্মচারী), পসারী (হাটে বাজারে পসার সাজিয়ে বিক্রয়কারী), পোতদার (মুদ্রার কারবারী বেনে), পোতা (কারাগারের প্রহরী), প্রাণ পিড়াসিল (প্রাণী হত্যাকারী), বড়ালিয়ার (জলদস্যু), ভাচা (যারা ধান ভেনে চাল তৈরি করে), ভাণ্ডারি (কোষাগারের কর্মচারী), মাটিয়া (জাতি বিশেষ, ভূমিজ), মাহুত (হস্তিচালক বা হস্তিতে আরোহী সৈনিক), মারাটা (মারাঠা জাতি বিশেষ), মাল (পালোয়ান, যোদ্ধা বা মল্ল), মাল (জাতি বিশেষ, সাপুড়ে), মিঞা (মুসলমান ভদ্রলোক), মুগরী (মুসলমান শ্রেণীবিশেষ), মুড়্যা পাকি (অগ্রগামী সৈনিক),

রায়বাঁশ্যা (বর্ষাফলক মুক্ত লাঠিয়াল যোদ্ধা), লবনিঞা (লবন বিক্রেতা), লোহানি (পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ), সিঙ্গাদার (শৃঙ্গবাদক), হাটুয়া (হাটে ক্রয়বিক্রয়কারী), হুনি (হুন জাতীয় পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ) প্রভৃতি জাতি গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে এছাড়াও যে সব লোকশিল্পী, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়, লোকশিল্পের স্রষ্টা-রক্ষক-বাহক-পরিপোষক কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে, তাদের বর্ণক্রম-অনুসারী তালিকা নির্ণয় করা সম্ভব। তারা হলেন- অবধৌত (বৈরাগী, অবধূত), আখন (শিক্ষক, ফারসী শব্দ), আশোয়ার (অশ্বরোহী), আহিড়ি (শিকারী), কলন্তর (যাযাবর ফকির সম্প্রদায়), কাণ্ডার (কর্ণধার, নাবিক), কোল (কোল জাতীয় সৈনিক), খুর প্রধারিনী (খুরপা, অস্ত্র-ধারিনী), গাবর (শ্রমিক বা জোয়ান নাবিক), গাবড় (সর্পবৈদ্য), গ্রামণ্য (গ্রামভারি ব্যক্তি,গ্রামের মাথা, গ্রামণী), ঘনা (তৈল প্রস্তুতকারী), ঘনেশ্বরী (ঘাতকদের নেতা), ঘোষণভূষণা (অলংকার পরিহিতা শব্দকারী ব্যক্তি), চতুর্মল (মল্লবীরের কাজ করেন এমন চারজন), চালুয়াতি (ধান ভানা যাদের বৃত্তি), চেটা (ভারবাহী ভৃত্যের কাজ বা ভার বোঝা বহন করা যাদের কাজ), চোয়াড় (বন্যজাতি বিশেষ), জবন (মুসলমান সৈনিক), জাতসেনা (সৈন্য বিশেষ, যাদু সৈন্য বা রাক্ষস সৈন্য), জানদার (গোয়েন্দা), জানি (গুণী, রোজা), জোগানিয়া (ভৃত্য বা অনুচর, সেবক), ডুবারু (ডুবুরি), ঢালিয়া (ঢাল-ধারী সৈনিক), তেলিয়া (তৈল্য ব্যবসায়ী), থৈকর (রাজমিস্ত্রি), দণ্ড (দণ্ড নায়ক বা কোটাল), দণ্ডরায় (দণ্ড মুণ্ডের কর্তা, রাজা), দেশমুখ (গ্রামের প্রধান প্রজা), দোহার (সহকারী গায়ক), ধামাতিকরনি (ধর্মাধিকরণিক), নড়ি (জাতি বিশেষ, যারা গালার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন), নফর (কর্মচারী বা চাকর), নেব (অধস্তন অনভিজ্ঞ রাজকর্মচারী), পারথি (প্রসবকারিণী ধাত্রী), পাঁজা (রাজ কর্মচারী বিশেষ, মোহর রক্ষক), ফরিকাল (বাহিনীর সৈনিক), বান্দি (চাকরানী), বেলকি (বেলক বাণধারী যোদ্ধা), মহাপাত্র (রাজমন্ত্রী বা রাজ পরিষদ), মহামত্ত (মাহুত), মহাঁডাসি (বড় জ্যোতিষী), মাঝি (জাতি বিশেষ), মেধা (গ্রামের প্রধান), রাউত (অশ্বারোহী যোদ্ধা), রাজভোট (রাজার স্তুতি পাঠ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন), সওয়ার (অশ্বারোহী), সুরানি (পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ), স্পানী (পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ), হাজরা (হাজার সৈন্যের নায়ক, রাজকর্মচারী বিশেষ)। লোকসমাজকে লোকশিল্পের এই প্রান্তিক স্রষ্টা-রক্ষক-বাহক এবং পরিপোষকেরা পূর্ণতা দিয়েছিল।

বিভিন্ন জাতি এবং তাদের লোকায়ত বৃত্তির উল্লেখ করে মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের বাংলাদেশের সমাজ বিভাগ এবং সমাজ বিন্যাসের একটি বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেছেন। যেখানে লোকায়ত মানুষ বিচ্ছিন্ন না থেকে সংহত এবং সমাজমনস্ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অনার্য কালকেতুর প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ঝরে পড়েছে কবির। মুসলমান সম্প্রদায় বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। এখানে মুসলমান জাতি বাঙালি সমাজের এক অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃত্তি এবং ধর্মগত উদারতা এবং আশ্চর্য সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিচয় মেলে। অপরপক্ষে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুদারতা ও উচ্চ-নীচ জাতিভেদ এবং কায়স্থতন্ত্রের অতি প্রাধান্য সমাজে বিভেদ তৈরি করেছে। লেখক কাব্যে কায়স্থের (পৃ: ৮১) উল্লেখ যেমন করেছেন, তেমনি কায়স্থের সভা (পৃ: ৮১), কায়স্থের মেলা (পৃ: ৮১), বসু-মিত্র (পৃ: ৮১) প্রভৃতি পদবীর উল্লেখ, সর্বোপরি কায়স্থ কুলতিলক ভাঁড়ু দত্তকে সুনিপুণ তুলির টানে চিরন্তন করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর ‘কবি কঙ্কণ-চণ্ডী’ গ্রন্থে লিখেছেন – “অন্যান্য জাতির মধ্যে কায়স্থের উল্লেখ কবির বিশেষ ঔৎসুকের পরিচয় বহন করে- সম্ভবত কায়স্থ-কুল-তিলক-ভাঁড়ু দত্তের মহিমা-রশ্মি সমস্ত জাতির উপরই বিচ্ছুরিত হইয়াছে। কায়স্থের কৌলন্যগর্ব ও নেতৃত্বস্পৃহা যেন ব্রাহ্মণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মসীজীবি-সম্প্রদায়ের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততা প্রথম কায়স্থের মধ্যেই স্ফূর্ত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের বহুল-বিভক্ত সাম্প্রদায়িক সংস্থিতি ও তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সরস বর্ণনা এক সমৃদ্ধ, প্রাণবেগচঞ্চল, দৃঢ়সংহত সত্তার ধারণা জন্মায়। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, ষোড়শ শতকের শেষপাদ যেন হিন্দু সমাজের একটি স্বর্ণযুগ ভেদের দুর্বলতা নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যের বহুমুখী কর্মোদ্যম ও সংহত সমবায়শক্তি আছে”। [৪]

বাঙালি প্রাচীন জাতি। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার বাঙালি জাতিকে শীলিত করেছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অংশ তার শিল্প ও শিল্প উপকরণ। বহু যুগের শিল্পীর সাধনা ও তপস্যার ফল এগুলি। এমন লোকশিল্পকে সুনির্দিষ্টভাবে তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে বিচিত্র লোকশিল্পের সমাহার। পূর্বে উল্লিখিত শিল্পগুলি ছাড়াও আরও যে সব লক্ষণীয় শিল্প কাব্যে স্থান পেয়েছে, সেগুলি মধ্যযুগের বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব ব্যবহৃত দ্রব্য বা লোকশিল্প-সামগ্রী

সংহত সমাজের লোকজীবনের অত্যাবশ্যক অংশ। বাংলা বর্ণক্রম অনুযায়ী লোকজীবনের এমন উপকরণকে বিন্যস্ত করা যায়-

অক্ষয়মালা (অক্ষমালা), অট্টলা (সৌধচূড়া), অবতংস (কর্ণাভরণ বা শ্রেষ্ঠ মালা বা চূড়া), আড়া (বাঁধ বা পুকুরের পাড়), আড়ানি (খড়ের ছাউনির নিচে আড়াআড়ি রাখা কাঠ বা বাঁশ), আড়ি (বেতের চুপড়ি), আনাত (ক্ষুর শানাবার চামড়া), আমসি (আমসত্ত্ব বা শুকনো আমের কুচি), আলবাটি (পিকদানি), আলান (হাতি বা নৌকা প্রভৃতি বাঁধার খুঁটি), আশগাড়ু বা পাশ-গাড়ু (আসেপাশের বালিশ), আস গড়ি (মাথার বালিশ), আঁকুড়ি (বক্রশীর্ষ দণ্ড), আঁচলা (উত্তরীয়, অঞ্চল), ইষ (লাঙলের ফাল), ইষু (বাণ), উড়ন (পরিধেয় বস্ত্র), উপানদ (জুতা), উরমাল (ঘুঙুর, ঘুণ্টি), উলটি ডাবর (পিকদানি), এক-মুদনিয়া (এক ছাউনির ঘর), কটু তৈল (সর্ষের তেল), কাড়িয়া জাঙ্গাল (ছোট রাস্তা), কড়্যা (খেলার জন্য বিশেষ কাষ্ঠ খণ্ড), কন্নিকা (কর্ণের অলংকার), কপালি (কপাট লাগানোর কাঠ), কবজ (বর্ম), কম্বুজ-বেশ (কম্বোজ দেশীয় পোষাক), করঙ্গ (কমণ্ডলু), করা ছুরি (একধার ছুরি), কর্ণাল (বাঁশি, হাতে ধরে যে বাঁশি বাজানো হয়), কর্ণিকা (কানের আভরণ), কলধৌত (সোনা রূপার অলংকার), কংষ (কাঁসি-বাদ্য বিশেষ), কাঙ্গুরা (চিলে কোঠা), কাচা (আটপৌরে কাপড়), কাঠদা (কুড়ুল, কাটারি), কাট শর (ধারালো শর), কাণ্ড (বাণ), কাণ্ডা ফলা (খড়্গ ফলক), কাতা (ক্ষুর), কাতি (কাটারি, খাঁড়া), কাদদা (কোদাল), কামান (বিশেষ ধনু বা আগ্নেয় অস্ত্র), কামিলা (কারুশিল্প), কালি হাণ্ডি (এক জাতীয় হাঁড়ি বা ছুতো হাঁড়ি), কালিয়া (কালো রঙ বা প্রসাধন দ্রব্য), কাঁঠি (এক ধরনের পুঁতি), কাঁথ (দেওয়াল), কাঁসড় (কাঁসর), কাঁসার (জলাশয়), কির্তি (বিবাহে ব্যবহার্য মঙ্গল বস্তু), কুচ্যামোড় (শেউনী বা সেনি জাতীয় বিশেষ জল ক্ষেপণের যন্ত্র বা লোক প্রযুক্তি), কুড়িআ বা কুড়্যা (কুঁড়ে ঘর), কুড়িআ(মালসা বা পাথরা), কুন্ত (বর্শা), কুন্দে (তক্ষণ যন্ত্র), কুপী (বাঁশের চোঙা বা তেল রাখার পাত্র), করোয়াল (দড়ি), কোঠার (এক দরজার সুদৃঢ় ঘর), কোনা (এক জাতীয় মাপক পাত্র), কোল (সরা, হাঁড়ির ঢাকা), কোলম কালা বা কৌসল কালা (বিন্যস্ত রন্ধনশালা), কৌড় (কড়ি), খড়কি (পিছনের দরজা), খমক (বাদ্য যন্ত্র), খরসান (বালির পুটুলি), খাণ্ডা (খাঁড়া), খাপরা (পাতলা মাটির পাত্র), খাম (স্তম্ভ বা খুঁটি), খামার (মাঠ থেকে শস্য তোলার স্থান), খালি (খাল), খিরখণ্ড (খিরের নাড়ু), খিরদক বাস (গরদ বস্ত্র), খিরী (রাবড়ি), খুঙ্গি (লেখার

সরঞ্জাম-পাত্র), খুঞা (খুঞা গাছের পাতা দিয়ে সুতোয় বোনা কাপড়), খুড়ি (ঘোড়ার যন্ত্রপাতি), খুরপা (মাটি খোড়ার যন্ত্র), খুরু (খুর), খেজাড়ি (খই, মুড়ি প্রভৃতি পাত্র ভরা খাদ্য), খেটক (ছোট গদা, ঢাল), খোল (বাদ্যযন্ত্র, মৃদঙ্গ), খোলসা (পাট, শন বা চটের বস্ত্র), গছ (বাঁকের ভার), গজঘোট (হস্তির আবরণ), গজঝম্প (হাতির পিঠে বিশেষ বাদ্যযন্ত্র), গজবেনি (হাতির পিঠের বাজনা বা জোড়াবাঁশি), গজমুতি (উৎকৃষ্ট মুক্তোর মালা), গড়া (থান কাপড়), গণেশ-বারা (গণেশ পূজার ঘট), গাউল বা গম্বল (বাঁশের আগায় ধ্বজা নিশান), গাড়ি (গর্ত বা জলাশয়), গাণ্ডি (ধনু), গুড়া (নৌকার ধারে বসান সরু পাটাতন), গুণ্যে (থলি), গুরুজ (বড় গদা বা কামান), গুণা (হাপর টানার দড়ি), গৃহমণি (মঙ্গল দীপ), গোড়া-রদা (ভিত্তি প্রস্তর বা ইটের খণ্ড), গোলা (আড়ত), ঘাঘর (ঘুঙুর বা বাজনা), ঘাঁটা (ঘণ্টা), চঞ (তরল গন্ধদ্রব্য), চড়ক (ফোটা বা ধুতি বিশেষ), চটচটি (চচ্চড়ি), চড়া (ধনুকের ছিলা), চরণ-নিছনি (পা-পোছা বস্ত্র), চষক (পান পাত্র), চাক (চাকা), চান্দ্রা (চাঁদোয়া), চাপাঢাল (দেহ ঢাকা ঢাল), চামঠুলি (চামড়ার চক্ষুবন্ধ), চামাতি (চর্মরজ্জু), চুনাতি-নালু (চুন রাখার পাত্র), চুপড়ি (ছোট ঝুড়ি), চেঙ্গি (বাঁশের তৈরী বড় পাত্র), চেয়াড় (তীক্ষ্ণ ধার বাঁশের ছাল), চোঙর ভোঙর (চামরের মত চক্রাকার শিরস্ত্রাণ), চৌখুরি (ছোট ধাতুপাত্র), চৌতুলা বা চৌতলি (এক ধরনের টুপি), চৌদোল (চতুর্দোল), ছইঘর (নৌযানের কেবিন), ছছন্দরি (ছুচোবাজি), ছটি (পায়ের অলংকার), ছাঁঞি (পিঠার পুর), ছাব (মোহর বা সীল), ছামানি (বিবাহে শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠানের জন্য বাঁধানো স্থান), ছুছুন্দর (হাউই, বাজি), ছেয়ানি (ছেনি), জউ (গালা), জগঝম্প (বড় ঢাক), জগতি (পূজামণ্ডপ), জনুর (কোমর বন্ধ), জমধর (দুই ফলা কাটারি), জয়পত্র (জন্মপত্র), জলযন্ত্র (পিচকারী), জলহরি (গৃহসংলগ্ন জলাশয়), জাউ (খুদের মণ্ড), জাওয়াতি (জন্ম পত্রিকা), জাঠ (বড় লাঠি), জাড়ি (মাটির জালা), জাদ (রেশম বা জরির ফিতে), জাবক (আলতা), জাঁত (পেষণ করা যন্ত্রবিশেষ বা লোকপ্রযুক্তি), জিন (ঘোড়ার পালান), জুলি (সংকীর্ণ জলনালা), জোর (পরিধেয় যুগ্ম বসন), জোয়ানি (জোয়ান মশলা), ঝানকাট (ছাঁচার বা দরজা প্রান্তের কাঠ), ঝানপাতা (চেরা বাঁশের খণ্ড), ঝাঁপা (অলংকার বা বস্ত্র বিশেষ), ঝুপড়ি (তৃণ বা পত্র কুটির), টঙ্গ (খনতা), টনটনি বা ঠিনঠনি (শুকনো ব্যঞ্জন বা শাক বিশেষ), টবর (বিশেষ হাতিয়ার), টাঙ্গ (মাচা বা টঙ), টাঙ্গি (ধারাল ছেদন অস্ত্র), টাটকা (মাটির সরা বা গড়া), টালি (চূড়া বা উঁচু

স্থান), টোকা (ছাতার মত তালপাতার টুপি), টোন (তূণ), ডম্ফ (বাদ্যযন্ত্র), ডম্বরু (বাদ্যযন্ত্র), ডাঙ্গ (খেলার ডাঙ), ডাণ্ডুকা (পায়ের বেড়ি), ডালি (শিরোভূষণ), ডিণ্ডি (বাদ্যযন্ত্র), ঢেমচা (বাদ্যযন্ত্র), তবক (বন্দুক), তবল (বাদ্যযন্ত্র), তম্বু (তাঁবু), তল্প (শয্যা), তাড় (অলংকার বিশেষ), তাড়বালা (অলংকার বিশেষ), তাড়িপত্র (তাল পাতার মত তরোয়াল), তান (আঙুল ঢাকা টুপি), তাম্বি (গণকের ঘড়ি), তুলাবটী (অলংকার বিশেষ, তুলার তোষক), 'তুলাকাঠি কোটি গুটি' (হাত বা পায়ের অলংকার বিশেষ), তুলি (তুলার লেপ বা তোষক), তোমর (যুদ্ধাস্ত্র – বর্ষা বিশেষ), দগড় (ঢাক বিশেষ), দড়মসা (বাদ্যযন্ত্র), দণ্ডপাট (দণ্ডদাতা রাজার আসন), দলিজ (দরদালান বা তোরণ), দাণ্ড (দাঁড়া), দাবা শিলি (পটকা বা বারুদ পোরা গুলি), দামা (বড় ঢাক), দারু (বারুদ), দাঁড়া (মাপের দণ্ড), দাঁত্যা (দেওয়ালের উপরে ছাউনির ধারক কাঠ), দীপিকা (জ্যোতিষ গ্রন্থ), দুর্গা মেলা (চণ্ডী মণ্ডপ), দেহারা (দেব মন্দির), দোখণ্ডি (বীণা জাতীয় বাদ্য যন্ত্র), দোপাটা (দুই ভাজ বা জোড়া বস্ত্র), দোয়াড়ি (মাছ ধরার বাঁশের কল), দোল পিণ্ডি (দোল মঞ্চ), দোলা (মনুষ্য বাহিত লোকযান), দ্বত (দোয়াত), দ্বাদশ বা দ্বায়াদশ (তাপস বা যোগীর বাদ্য, বিশেষ ঝুমঝুমি), ধড়ি (পরিধান বস্ত্র), ধনুক দেশনা (অস্ত্র বিদ্যা শেখার উপকরণ), ধান ঘর (গোলা ঘর বা মরাই বাড়ি), ধুকড়ি (কাঁথা বা ছেঁড়া কাঁথা), ধুতি (পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ), ধুসরি (দুই সারি ছিদ্র যুক্ত বাঁশি), নখর রঞ্জিত (নরুন), নড়ি (লাঠি), নবাত (গুড়ের পাটালি), নসান (তীক্ষ্ণ ধার কাটারি), না (নৌকা), নায়াড়া (নৌকার শ্রেণী), নাকানি চেঙ্গি (জল রাখার পাত্র বিশেষ), নাছ বাট (সদর রাস্তা), নাটা (নাটাই), নাড়ি (নাড়ির মত দড়ি), নাদীয়া (বড় মাটির পাত্র), নাবরা (নিরামিষ ব্যঞ্জন), নিকষ শিল (কষ্টিপাথর), নিকারি চিঙ্গি (পাত্র বিশেষ), নিছনি (বস্ত্র বা গামছা বিশেষ), নুনী (দুগ্ধজাত ননী), নেজা (বর্শা), নেত (উৎকৃষ্ট সুতী বস্ত্র), পটুকা (কোমরবন্ধ), পট্টি (মোটা বস্ত্র), পট্টিশ (বর্শা বিশেষ যুদ্ধাস্ত্র), পড়া (বাদ্যযন্ত্র), পড়্যান (বাটখারা), পত্রবাল (নৌকার হাল), পরিখ (লৌহদণ্ড), পলো (মাছ ধরার ঝুড়ি), পসরা (ঝুড়িতে সজ্জিত বিক্রয় দ্রব্য), পাই (ক্ষুদ্রতম মুদ্রা), পাউড়ি (জুতা বা খড়ম), পাগ (মাথায় পরার সূক্ষ্ম বসন), পাছুড়ি (উত্তরীয়), পাজাল (কোদাল), পাট (পট্টবস্ত্র), পাট (গোলাকার বড় মৃৎপাত্র), পাট (কাদা বা ইটের গাঁথনির সারি), পাট কথুবা (পাটের মোটা কাপড়), পাটা (ফোঁটা), পাটি (ঘাস বা কাঁঠিতে বোনা শিল্পকর্ম), পাটিকাল (ইঁটের টুকরো), পাটী

(পাশার চালন কাঠি), পাটুআ (কোদাল), পাড়ি (তোষক, গদি), পাতন (কাঁড় বা ক্ষুরধার শর), পাতি (পত্র বা চিঠি), পাতুলি (পাতার বস্ত্র বা আস্তরণ), পাথরা (পাথর বা মাটির থালা), পাথী (ছোট পাত্র), পান (তাম্বুল), পানঞি (জুতা), পাবড়া (ছোট কাঠের দণ্ড), পামরি (অলংকৃত সূচীকর্ম), পাশা - সারি (পাশার ঘুটি বা কাঠি), পাশ – গাড়ু (পাশ – বালিস), পাসলি (পায়ের অলংকার), পাঁজলা (নৈবেদ্য), পাঁজি (গুটানো পুঁথি), পিড়া (বসার আসন), পিণ্ডিকা (বেদি), পুড়া (গোলাকার শস্যাধার), পুটল (পুটলি), পেড়ি (ছোট বাক্শ, পেটিকা), পোড়গ তেল (কবিরাজি তৈল), পোতা (ঘর বা কারাগার), প্রসাধনি (চিরুনি), ফন্দ (ফাঁদ), ফাঞি -ফট্ট (তুবড়ি বোমা), ফুলঘর (ফুলের তোড়া), ফেনি (বাতাসা), বউলি (কানের অলংকার), বকাল (মদ তৈরির মসলা), বটলই (কাঁসার বাসন), বনমালা (পুষ্প-পাতায় গ্রথিত মালা), বরঙ্গ (শিঙ্গা), বোরজ (পান চাষের ঘর), বর্গভীমা (তমলুকে অবস্থিত পৌরাণিক দেবীর মূর্তি), বল (দাবার ঘুঁটি), বল্কবাস (বল্কল বসন), বল্ককি (বীণা বিশেষ), বাগুরা (পশুপাখি ধরার জাল), বাঘনখ (অলংকার বিশেষ), বাঘহাতা (হাতকড়ি), বাটা (গৃহস্থালি দ্রব্য), বাটুল (গুলি দিয়ে পাখি মারার অনার্য অস্ত্র), বাড়া (বেড় বা লাঠি), বাথান (গোঠ বা গোরু রাখার স্থান), বানা (পতাকা), বারা (জলপূর্ণ পূজার ঘট), বাশী বা বাসী (কুড়ুলের মত একপ্রকার ছেদন অস্ত্র), বিছন – পুড়া (বীজধানের গোলাকার গোলা), বিড় বা বিড়া (পানের খিলি), বিদ (পুতির মালা), বীরঢাক (জয়ঢাক), বীর – বালা (মল্ল যোদ্ধার ভূষণ), বুহিত (নৌযান), বেঙ্গা (ধাতুর খাদ মিশানো পিতল কাঁসার অলংকার), ‘বেজাক নুরলি যন্ত্র’ (বাঁশ নলের পিচকারি), বেটলা (কোমর বন্ধ), বেনি (বাঁশি), বেবাজ (শুল্কহীন হাট), বেলক (খন্তা), বেসারি (বেসন বা বাটা মসলা), ভরা (নৌ বাণিজ্যের পণ্য), ভিন্দিপাল (অস্ত্র বিশেষ), ভুষণ্ডি (অস্ত্র বিশেষ), ভেটা (শিশুর খেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড), ভোট (পাহাড়ি দেশের কম্বল), মউর (বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কন্যার মুকুট), মুকুট (মউর), মট (মঠ), মদগুর (মুগুর), মরাই (গোলাকৃতি নয় এমন ধানের গোলা), মল বাঁকি (বাঁক মল), মসারী জালি (জালের মসারী), মসিদ (মসজিদ), মসীপত্র (কালি ও দোয়াত, কালির দোয়াত), মস্করা (পূজা উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত বংশদণ্ড), মহিষা (মহিষ – দুগ্ধজাত দ্রব্য বা মহিষ – চর্ম নির্মিত দ্রব্য), মহীষিয়া (মহিষচর্ম নির্মিত দ্রব্য), মাচিয়া (চৌকি মঞ্চ), মাজকুড়া (মধ্য শিখর বিশিষ্ট আসন), মাজ্যা (গৃহতল), মাটিয়া (মাটির জলপাত্র), মাথা –

মউড়ি (মাথার মুকুট), মালুম কাঠ (নৌকায় যে কাঠের উপর দাঁড়িয়ে দিশারি দিক নির্ণয় করেন), মুকুলিকা (পুষ্প মালার মত কর্ণাভরণ), মুঠি (হাতল), মুড়ালী বা মুড়াল্যা (নৌযানের শীর্ষদেশ), মুতিয়ার (মুক্তা ছড়ার অলংকার), মুরজ (বাদ্যযন্ত্র), মুসরি (মশারি), মৃত্তিকা – শঙ্কর (মাটির গড়া শিবলিঙ্গ), রইঘর (নৌযানের কেবিন বা ঘর), রদ (হাতির দাঁত, হাতির দাঁতের অলংকার), রসান দর্পণ (উজ্জ্বল ধাতু লাগানো আয়না), রাঙ্গি (রাঙা জামা), রাম – কুড়্যা (রামের কুটির), রায় বাঁশ (বর্ষা ফলক যুক্ত লাঠিয়ালের লাঠি), রায়বেনি বা হয়বেনি (ঘোড়ার উপর বাদ্যভাণ্ড), লাড়ু গঙ্গাজল (গঙ্গাজল রঙের নাড়ু), লাজহোনি (খই দিয়ে হোম), শালভঞ্জি (পুত্তলিকা বা পুতুল), শিপ (কোশাকুশি), শুখান (শুষ্ক জলাশয়), শৃঙ্গনাদ (বাজানোর শিঙা), শ্রুপ (যজ্ঞের কাজে ব্যবহৃত কাঠের হাতা), ষাঠ্যারা (নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে ব্যবহৃত আতুরঘর বা আঁতুরঘরের কাজ), সইবানা (সামিয়ানা), সকল্লাথ (পশমি বস্ত্র), সড়গ (শকট), সদর (রাজভাণ্ডার), সপ্তস্বরা (সপ্ততন্ত্রী বীণা), সফর-খান (বাণিজ্য যাত্রায় থাকার আস্তানা), সাঙাল (পাটের বোনা), সাতনল বা সাতনলা (পাখি ধরা আঠাকাঠি), সান (পাথর বাঁধানো ঘাট), সানা (তাঁতের চিরুনি), সানি (সানাই), সায়বানি (সামিয়ানার মণ্ডপ), সাঁজাকুড়া (সংযুক্ত কুণ্ডের মত আসন), সাঁড়ক (খড়ের ছাউনিতে আড়ানির নিচে দীর্ঘ বাঁশের বাতা), সাঁপুড়া (হাত বাকস), সিঅনি (শেউনি বা সেচপাত্র, জল ছেঁচার পাত্র বিশেষ), সিখিবান (অগ্নিবাণ), সিপ (কোশাকুশি), শিলী (হাউই), সিংহনাদ বা শৃঙ্গনাদ (বাজাবার বিশেষ শিঙা), সিংহা (শিঙা), সীঙলি (শিউলি রঙের গামছা), সুকুতা (ব্যঞ্জন বিশেষ), সুপ (পাতলা ডাল, ব্যঞ্জন), সুসঞ্জিত (নির্বাচিত শরধনু), সেজি (শয্যা), সেল (শেল), স্থল (স্থালী, থালী বা পাত্র), হড়পি (বাক্স বিশেষ), হাই – হামলাতি (আমলকীর তেল), হাট ঘরা (হাটের ঘর), হাড় খাল (সংকীর্ণ জলপথ), হাথবাগা (হাতকড়া), হানু (খাবারের দোকান), হামার (শস্যাগার), হিরামুঠি (হীরা বাঁধানো ডাঁটি), হুদুরা (অনাথ মণ্ডপ) প্রভৃতি। শিল্পগুলি বাঙালি সংস্কৃতির বহু যুগের সাধনার ধন। ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত। বংশ পরম্পরায় শিল্পীদের অনুশীলনের ফলে এমন শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির অপরিহার্য অত্যাবশ্যক অঙ্গ এগুলি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এমন শিল্পে টইটম্বুর।

কালকেতু ব্যাধ। ধর্মকেতুর পুত্র। অনার্য ব্যাধ যুবক কালকেতু। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু। তিনি সাঁওতাল। ব্যাধ এবং পশুদের দেবী চণ্ডী। শিকারজীবী সাঁওতাল, মুন্ডা, বীরহোড় এবং আদিবাসী ওঁরাওদের দেবী হতে পারেন চণ্ডী। অথবা নিম্নবর্গীয় হিন্দু হাড়ী জাতির দেবী হতে পারেন চণ্ডী। H. H. Risley (Herbert Hope Risley) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর "The Tribes and Castes of Bengal" গ্রন্থে 'Santal' প্রসঙ্গে লিখেছেন – "At the bottom of the social system, as understood by the average Hindu, stands a large body of non-Aryan tribes and castes, each of which is broken up into a number of what may be called totemistic exogamous septs. Each sept bears the name of an animal, a tree, a plant, or of some material object, natural or artificial, which the members of that sept are prohibited from killing, eating, cutting, burning, carrying, using, etc. Well-defined groups of this type are found among the Dravidian Santals and Oraons, both of whom still retain their original language, worship non-Aryan gods, and have a fairly compact tribal Organization. [...] with similar rules as to the totem being taboo to the members of the group". (৫)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম অনার্য জাতির শিল্প পরিচয় স্পষ্ট করেছেন। কালকেতু ফুল্লরার সাংসারিক গৃহজীবন, ফুল্লরার বারমাস্যা ব্যাধ জীবনের দৈনন্দিন দীনতা, ঘর-গেরস্থালীর রিক্ততা, জীবনসংগ্রাম এবং হরগৌরীর অনাহার-অর্ধাহার ক্লিষ্ট জীবন চিত্রের মধ্যে বিচিত্র লোকজীবন ও লোকশিল্পের অনুষঙ্গকে স্পষ্ট করেছেন। মুকুন্দরাম 'কালকেতুর বিবাহ উদ্যোগ' অংশে লিখেছেন –

"গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটি

চারিদিকে বন্ধুগণ মেলা"। (৬)

আবার 'কালকেতুর ভোজন' অংশে কবি লিখেছেন –

"সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।

বেঞ্জন খাইতে দিল নূতন খাপরা"। [৭]

আবার 'ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন' অংশে কবি লিখেছেন –

"আঁচল ভরিয়া তারে দিল খই-মুড়ি।

বসিবারে দিল তারে চৌখন্ডিয়া পীড়ি"। [৮]

আবার 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' অংশে কবি লিখেছেন –

'নিযোজিত কৈল বিধি সবার কাপড়।

অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়"। [৯]

মুকুন্দরাম 'কালকেতুর ভোজন', 'ফুল্লরার খেদ', 'ফুল্লরা কালকেতুর কথোপকথন', 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ', 'কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয়' প্রভৃতি অংশে বিচিত্র লোকশিল্পের প্রসঙ্গ এনেছেন। এক্ষেত্রে কখনো ব্যাধ নন্দনের ভোজনের আতিশয্য, কোথাও ব্যাধ জীবনের বাস্তবতা, কোথাও বিবাহের কৌতুকরস, কোথাও অনার্য ব্যাধ রমণীর দারিদ্র্য জর্জর বিবাহিত জীবনের অসম্পূর্ণতা, কোথাও দুঃখের বারামাস্যা প্রভৃতির মধ্য থেকে ষোড়শ শতকের উপল ব্যথিত সমাজকে চিহ্নিত করেছেন কবি। কাব্যে উল্লিখিত লোকশিল্প কবির বাস্তবতাবোধকে পুষ্ট করেছে। জীবন প্রেমিক কবি জাতি এবং বৃত্তিকে সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করেছেন। 'মাটির পাথরা', 'নূতন খাপরা'র উল্লেখ ব্যাধ সমাজের দারিদ্র্য পরিকীর্ণ জীবনের ছবিকে স্পষ্ট করে। বিবাহ বাসরে পাওয়া কুমকুম এবং কস্তুরী ফুল্লরার কাছে অমূল্য। অনার্য আচার, প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কার লোকশিল্পের আধারে সমাজ কেন্দ্রিক ধরতায় লোকজীবনকে পূর্ণতা দিয়েছে। অন্নবস্ত্রহীন দারিদ্র্য জর্জর অনার্য ব্যাধ রমণীর বিবাহের বিগত সুখস্মৃতি সামান্য তুচ্ছ প্রাপ্তির মধ্যে ধরা পড়েছে। 'ফুল্লরার ও কালকেতুর কথোপকথন' অংশে সহায় সম্বলহীন এবং উপায়হীন কালকেতু ফুল্লরাকে কিছু ধার নেওয়ার জন্য সখীর বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সেই পরামর্শ মেনে ফুল্লরা যখন সখীর বাড়িতে গেছেন, তখন সখী তাকে আপ্যায়ন করেছেন। বসার জন্য দিয়েছেন 'চৌখন্ডিয়া পীড়ি'। এখন পীড়ি আজ একান্তই লুপ্তপ্রায় লোকশিল্প। ফুল্লরা বারোমাসের দুঃখের বর্ণনা দিয়েছেন, পরনের বস্ত্রও তার মেলে না। সহায় সম্বলহীন উপায়হারা ফুল্লরা 'হরিণের ছড়' পরিধান করেন।

অভাব অনটনের কারণে 'মাটির পাথরা' টিকেও বন্ধক রাখতে হয়। এরপর দেবীর কৃপায় কালকেতুর অর্থ প্রাপ্তি হয়েছে। অনার্য জীবন থেকে কালকেতুর উত্তরণ ঘটে যাচ্ছে। শীলিত সংস্কৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হচ্ছেন তিনি। তিনি কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করেছেন। অনেক অনুচর তার সঙ্গী হয়েছেন। সেবকেরা চামর দোলাচ্ছেন। কালকেতু বসেছেন 'দুলিচার' উপরে। কানে কলম, হাতে দোয়াত, বিচিত্র সোনা হীরার অলংকার এবং পাটের তৈরি সাজা-কুড়া, চন্দন কাঠের কুড়া, মতিহার, নানা স্বর্ণালঙ্কার, চৌদল, খাট পালঙ্ক প্রভৃতি লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন কবি। এছাড়াও 'কালকেতুর বাল্যক্রীড়া' অংশে কবি লিখেছেন –

"চামের টোপর শোভে শিরে"। [১০]

ব্যাধ সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত লোকশিল্পের উল্লেখ রয়েছে এখানে। 'চামের টোপর' এবং 'জালের দড়ির' উল্লেখে অস্ট্রিক অনুশাসনের ছাপ স্পষ্ট। এই শিল্পগুলি ব্যাধ সমাজের জীবন ঘনিষ্ঠ দৈনন্দিন প্রত্যয়ের সঙ্গে একান্তই সংশ্লিষ্ট। চর্ম নির্মিত এমন টোপর আজ আর তেমন ব্যবহার হয় না। ব্যাধসন্তান কালকেতুর নিত্য প্রয়োজনীয় লোকদ্রব্য ধনুকের উল্লেখ আছে 'কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ' অংশে। যে ধনুকে কালকেতুর খ্যাতি অর্জুনের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের কাছে ধনুক এক অত্যাবশ্যক শিল্পদ্রব্য, যা তাদের কাছে জীবন এবং সংগ্রামের সারসত্য বলে বিবেচিত। জীবন ধারণের সেই কঠিন সময়ে ধনুক বাঁচার প্রকৌশল, আরণ্যকশিল্পও।

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'পুরী নির্ম্মাণ' এবং 'কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণের' কথা লিখেছেন। দেবীর আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে পুরী নির্মাণ করেছেন। সেই সূত্রেই ষোড়শ শতকের নির্মাণ শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় –

'প্রথমে প্রাচীর বিশাই কৈল চারি পাট

বাউটী পাথরের বীর দিল ঝনকাট

তালতরু সব উচ্চ হৈল প্রাচীর।

পাথরের দাঁত্যা দিল হনুমান বীর।।

মুড়লী রচিয়া তাহে আরোপিল কাট।

চারি হালা খড়েতে ছাইল চারি পাট।।

উত্তরে খিড়কি সিংহদ্বার পূর্ব্বদেশে।

শিলাতে রচিল নাটশালা চারিপাশে। (১১)

কালকেতুর গৃহনির্মাণ বিশ্বকর্মা এবং হনুমানের প্রসাদলব্ধ, আসলে তা সমকালের স্থাপত্যশিল্পীর। তথাপি তালগাছের সমান প্রাচীর, খড়ের ছাউনির চালা, পাথরের পিড়, ঘরের অন্তঃপুরের সরোবর, নাট্যশালা, পাকশালা, চণ্ডীমন্দির, মন্দিরের গায়ে চিত্রের আলপনা প্রভৃতির মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের গ্রাম্য শোভনতার পরিচয় মেলে। বিশেষত খড়ের চালের প্রসঙ্গ বাদ দেননি মুকুন্দরাম। এসব শিল্পচিত্র গ্রাম নির্ভর কৃষিভিত্তিক সময়ের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত।

'গুজরাট নগর নির্ম্মাণ'-এর মধ্যে সেকালের নগর নির্মাণের সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং ধীশক্তির পরিচয় মেলে। মুকুন্দরামের কাব্যে বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতকে প্রথম বিন্যস্ত নগর পরিকল্পনার (অরণ্য কেটে প্রজাবসতি বা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নির্মাণ) ছবি পাওয়া যাচ্ছে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আহ্বান আছে কালকেতুর। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য কৃষক বুলান মণ্ডলের প্রতি তাঁর আহ্বান –

"শুন ভাই বুলান মণ্ডল

আস্যগা আমার পুর সন্তাপ করিব দূর

কানে দিব কনক-কুণ্ডল।।

আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ

তিন সন বহি দিহ কর।

হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা

পাট্টায় নিশান মোর ধর"।। (১২)

লোকশিল্প প্রান্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কর্মমুখর জীবনের প্রতিরূপ। বাংলার লোকশিল্পের প্রকৃত শিল্পীরা হলেন অনার্য বা ব্রাত্য-অপাংক্তেয় নিম্নবর্গীয় মানুষ। Prannath Mago, তাঁর ' Contemporary Art In India: A Perspective' গ্রন্থে লিখেছেন –"The tradition in folk art reflects the continuous play of line and colour which is native to the mind of India". (১৩)

কালকেতুর গুজরাট নগরে বসতি স্থাপন করেছেন মুসলমানেরা -

"ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী

পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।

.....।

না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে

ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি।।

আপন টোপর নিয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া

ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত"। (১৪)

এসেছেন শিল্পী মুসলমান সম্প্রদায় -

"তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।।

.....

পিঠা বেচি কেউ নাম ধরাল্য পিঠারি

.....

সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম।

.....

তীরকর হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর।।

.....

কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।

নানা স্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া।।

কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা"।। [১৫]

এসেছেন গোপ-তেলি-কামার-তাম্বুলি প্রভৃতি লোকশিল্পীরা। এসেছেন কুমোর-তাঁতি-মালি-মোদক প্রভৃতি লোকশিল্পীরা। এসেছেন গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক, কাঁসারি, সুবর্ণ বণিক, স্বর্ণকার এবং পল্লগোপ প্রভৃতি বৃত্তিজীবী শিল্পীরা। এছাড়া এসেছেন কলু, বাইতি, বাগদী, মাছুয়া, দরজী,শিউলী, ছুতার, চুনারি, মালডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শিল্পীরা।

লোকশিল্প লোকায়ত মানুষের হাতের সৃষ্টি। লোকশিল্প আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব বর্জিত। কারখানা ঘরে কলের তৈরি শিল্প নয়। প্রয়োজন এবং উপযোগিতা লোকশিল্প সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর সঙ্গে শিল্পীর সহজাত শিল্পবোধ ও সৌন্দর্য চেতনা শিল্পকে দৃষ্টিনন্দন করেছে। Encyclopedia Britannica গ্রন্থের 'Folk Arts' অধ্যায়ে লোকশিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে – "Typically, the people who created the art immediately concerned with producing the necessities of life; as a result, the art is often described as predominantly functional or utilitarian, in spit of the fact that there are important categories that are definitely not utilitarian, such as the widespread miniatures created simply for pleasure. [....] The most easily distinguished characteristics of folk art as a whole relate to materials and techniques. Most commonly used were the natural substances that came readily to hand". [১৬]

কালকেতুর নগর পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের বিচিত্র কৌশল লক্ষ করা যায়। গুজরাট নগর নির্মাণের কালেই দেখা যাচ্ছে, প্রস্তর নির্মিত নাট্যশালা, বিষ্ণুমন্দির, জলাশয়, নমাজগৃহ, মসজিদ, রন্ধনশালা প্রভৃতি স্থাপত্যকলা পরিকল্পিত পরিপাটির

বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। এছাড়া পুরী নির্মাণ, কালকেতুর গৃহনির্মাণ, নগর পত্তনের পরিকল্পনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে।

নানা বৃত্তিজীবী মানুষের লোকশিল্পকলা কাব্যটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। কালকেতু যত ইচ্ছা চাষ করার শর্তে এবং কর ছাড়ের শর্তেও বুলান মণ্ডলকে তার নগরে বাস করার আহ্বান জানিয়েছেন। এসেছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, লোহিত পাটি বিছিয়ে যারা নমাজ পাড়েন। সেই অনুষঙ্গেই লোকশিল্প হিসাবে লোহিত পাটি এবং টোপর এসেছে। কাগজী এবং দরজী সম্প্রদায়ের লোকশিল্পীদের দেখা যাচ্ছে, যারা কাগজ এবং কাপড় তৈরি করেছেন। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসেছেন, তাদের হাতে কমণ্ডলু, লাঠি এবং গলায় তুলসী কাঠি। যারা দেশে দেশে যজমানি করে ফেরেন। এই ব্রাহ্মণেরা লোহিত বর্ণের ধুতি পরেন, সঙ্গে রাখেন শঙ্খ, চামর এবং পুঁথি। নকসী কাঁথা এবং লাঠি তারা রাখেন। বোঝা যাচ্ছে, অর্কমণ্য কর্মবিমুখ এক পরজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। এসেছে ভাঁড়ু দত্তের মত কায়স্থ। এই 'দত্ত' পদবী ধারী ভাঁড়ু। এরা কর্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক। এরা মনে করেন, 'ভব্যজন নগরের শোভা'। ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত উপাধিধারী এই ভব্য জনেরা আবেদন করেন কালকেতুর কাছে –

"হাল বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন পুড়া

ভান্যা খাত্যে ঢেকী কুলা দিবে"। [১৭]

ঢেঁকি, কুলা প্রভৃতি লোকশিল্পের প্রসঙ্গ এসেছে ভাঁড়ু দত্তের বক্তব্যে।

গোয়ালা ও অন্য জাতির সূত্রে নানান লোকায়ত বৃত্তি এবং অভাব পীড়িত মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রাণান্তকর চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম এসব শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির উল্লেখ সূত্রে জীবনরস রসিকতার যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি অলৌকিকতা বর্জিত বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছেন। তেলি, কামার, কুমোর, তাঁতি, মালী, মোদক, গন্ধবেণ্যা, কাঁসারি, সুবর্ণবণিক, পল্লগোপ (গোয়ালা) সম্প্রদায়ের মানুষজনের সূত্রেই ধুপ, ফুলঘর, পাটের শাড়ী, থালা, ধুতি, নূপুর, ঘণ্টা, পঞ্চদীপ, কোদাল প্রভৃতি লোকশিল্প বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন অংশে কলুর ঘানি, বাইতি সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্র, বাগদি পাইকের অস্ত্রশস্ত্র, শিউলীর গুড়

তৈরি, চুনারি সম্প্রাদায়ের চুন তৈরি, বাউরি, চণ্ডাল এবং ডোমের ঝুড়ি, লবন এবং ছাতা তৈরির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন কবি।

এছাড়া গুজরাট দর্শনের অপূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন কবি। গুজরাটে কলিঙ্গরাজ দূত প্রেরণ করেছেন। এই সূত্রেই 'অজিন আসন' এবং কালকেতুর পাশা খেলার উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম। এছাড়া উল্লেখ আছে পুষ্পমালার। কালকেতুর ঐশ্বর্য ও সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এখানে এসেছে শঙ্খ, বেণু, বীণা, তুরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। ঈর্ষাপরায়ণ কোটাল দ্রুত পায়ে কলিঙ্গরাজের কাছে চলেছেন। কলিঙ্গরাজ গুজরাটের বর্ণনা শুনেছেন। যেখানে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে। শঙ্খ, ঘণ্টা ও বীণা বাজে। আর বাজে কাঁসর, জগঝম্প, মৃদঙ্গ ও মন্দিরা। গুজরাজ নগরের অধিবাসীরা পরিধান করেন তসরের কাপড়। তসর আজ বাংলার লুপ্তপ্রায় শিল্প। এককালে বাংলার অন্যতম শিল্প হিসাবে তসর শিল্পকে ধরা হত। কলিঙ্গরাজ যুদ্ধ সজ্জায় বেরিয়েছেন। শেল, শর, খাণ্ডা, জাঠা এরকম প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রের উল্লেখ করেছেন কবি। পদাতিক সেনাবাহিনীর উল্লেখ সূত্রে 'বাজান নূপুর', 'সোনার টোপর' এবং 'চামর নিশানের' প্রসঙ্গ এসেছে কাব্যে। সেকালে যুদ্ধে রথ ব্যবহৃত হত। যুদ্ধ প্রসঙ্গে কাব্যে এসেছে রথ। অস্ত্রের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কাব্যে। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে লোহার মুদ্গরের পাশাপাশি দুন্দুভি, দামামা, শিঙ্গা, ঢোল প্রভৃতি এসেছে। কালকেতুর রণসজ্জাতে সোনার নূপুর, শিঙ্গা, চৌখণ্ডি, কাঁড় এবং হাঁড়িয়া চামরের উল্লেখ আছে। আবার যুদ্ধরত কালকেতুর বীরমূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালকেতুর যুদ্ধের সময়ে উল্লিখিত লোকশিল্পগুলি হল 'ডিন্ডিম ডম্বর', 'জগঝম্প' প্রভৃতি। সেকালে যুদ্ধসজ্জার বাদ্যযন্ত্রগুলি মোটামুটি একই রকম। সেকালে ধুতি পরার চল ছিল। কাব্যে এসেছে – 'এক লক্ষ টাকা তুমি খাইলে যে ধুতি'।[১৮] সেই কায়স্থ কুলতিলক ভাঁড়ু দত্তেরা আজ আর ধুতি পরেন না। হারিয়ে যাচ্ছে সেকালের অনেক শিল্পকলা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'দক্ষের শিবনিন্দা', 'গৌরীর অধিবাস', 'শঙ্করের ভিক্ষা' প্রভৃতি অংশে আরণ্যক সময়ের শিল্পকলা ধরা পড়েছে। নরমুণ্ড মালা, হাড়ের মালা শিবের ভূষণ। পৌরাণিক পটভূমিকা বিধৃত শিব চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছেন কবি। শিবের অলংকার তার দারিদ্র্য, দারিদ্র্যই তার ভূষণ। শিবের পরিধান বাঘছাল। শিবের বাদ্যযন্ত্র শিঙ্গা, শিব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন ডম্বরু নিয়ে, হাতে শোভে লাউয়ের থালা। শিবের

ভিক্ষাপ্রাপ্তি কড়ি, ডাল বড়ি, কুপি প্রভৃতি। যেগুলি একান্তই লুপ্ত। এই শিল্পগুলি হারিয়ে যাওয়া সময়ের প্রতিভাস। একালে এই শিল্পের আঙ্গিকগত বিবর্তন ঘটেছে। শিব চরিত্রের সঙ্গে এইগুলি এতবেশি সম্পৃক্ত যে এগুলি ছাড়া চরিত্রটির মহিমা অক্ষুণ্ন থাকে না। চণ্ডীপূজা অংশে মুকুন্দরাম শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, খমক, জগঝম্প, ডমরু, মৃদঙ্গ এবং দোখণ্ডি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। শঙ্খ এবং ঘণ্টা বাঙালি সমাজে কমে গেলেও সেগুলি আজো কিছু হলেও টিকে আছে। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রগুলি আজ প্রাচীন পুঁথি ছাড়া কোথাও মেলে না। এক বিস্মৃত উপকথার মত বাঙালির স্মৃতিকে আলোড়িত করে মাত্র। 'কলিঙ্গরাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ' অংশে পৌরাণিক কালিকামূর্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন কবি। কালিকমূর্তির গলায় মুণ্ডমালা। এক আদিম রহস্যময় আরণ্যক বীভৎসতা প্রতিভাসিত হয়। 'রতির খেদ' অংশে মদন ভস্মের পর 'রতির খেদের' উল্লেখ আছে কবিতায়। রতি স্বামীর চিতায় আগুনে অনুমৃতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তিনি 'চতুর্দ্দোলা'য় চড়েছেন। রতির সহমৃতা হওয়ার সূত্রেই চতুর্দোলার উল্লেখ। শীলিত পারিবারিক পরিমণ্ডল এবং অভিজাততন্ত্রের অনুষঙ্গেই চতুর্দোলা এসেছে। ষোড়শ শতক পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপী চতুর্দোলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ছিল। একালে চতুর্দোলা মোটামুটি লুপ্ত লোকশিল্প।

কাব্যে 'দেবীর আজ্ঞায় পুরী নির্ম্মাণ' অংশে যে দেউল নির্মিত হচ্ছে তা অভিজাততন্ত্রের দ্যোতক। সেই মন্দির প্রস্তর নির্মিত। হীরা, নীলা, প্রভৃতি মূল্যবান পাথরে প্রস্তুত এমন মন্দির। আর সাদা চামর, যে চামর আজ লুপ্তপ্রায়, সেই মন্দিরের উর্ধ্বচূড়ে চামরের উপরে আছে নেতের পতাকা। শীলিত সমাজের শিল্প নমুনার স্মারক হয়ে আছে দেব দেবীর আদেশে নির্মিত মন্দির। এছাড়া 'রাজার স্বপ্ন বিবরণ' অংশে রাজ ছত্রের উল্লেখ আছে, আছে শঙ্খ বাদনের ধ্বনি।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রন্ধন শিল্পের বিচিত্র বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। প্রথমত, কবি এক দিকে অনার্য অস্ট্রিক ব্যাধ সম্প্রদায়ের রন্ধন শিল্পের চিত্র এঁকেছেন। দ্বিতীয়ত, কবি পরিশীলিত সমাজের রন্ধন চিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের রন্ধন শিল্পের পরিচয় পৃথকভাবে এঁকেছেন। 'নিদয়ার সাধ ভক্ষণ' অংশে কবি নকুল, গোধিকা পোড়া, হাঁসের ডিমের বোড়া, চিংড়ি বোড়া এবং সজারুর শিকপোড়ার উল্লেখ করেছেন। অসংস্কৃত ব্যাধ সমাজের রন্ধন তালিকায় বড়ির ব্যবহার

রয়েছে। রান্নার বড়ি মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা অংশের নিজস্ব শিল্প। ষোড়শ শতকে বড়ির ব্যবহার অস্ট্রিক সম্প্রদায় অধ্যুষিত সমাজে প্রচলিত হচ্ছে, যা ব্যাধ সম্প্রদায়ের পরিশীলিত সাংস্কৃতিক শুদ্ধিকরণের (Sanskritization) চিহ্নকে বহন করে। কাব্যে ফুল বড়ির সঙ্গে মরিচের ঝালের উল্লেখ রয়েছে। এই রন্ধন শিল্প ষোড়শ শতকের দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক ব্রাত্য অনার্য ব্যাধ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর রন্ধন শিল্পকে স্মরণ করায়। পাশাপাশি 'হরগৌরীর কলহারম্ভ' অংশে ফুলবড়ি হরপার্বতীর রন্ধনশালায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু সজারুর শিকপোড়া বা নকুল, গোধিকাপোড়া এখানে অনুপস্থিত। বড়ি রন্ধনশালার সুস্বাদু একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। 'ফুল বড়ি দিবে তাহে আর আদারস' কিংবা 'ঘৃতে ভাজি দুগ্ধেতে ফেলিবে ফুলবড়ি' ছাড়াও কুমড়ার বড়ির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। তৃতীয়ত, 'ব্রাহ্মণদের আগমন' অংশে আগন্তুক ব্রাহ্মণদের 'ডালবড়ি' দেওয়ার উল্লেখ করেছেন কবি। মধ্যযুগের ভোজনরসিক বাঙালির রসনা যে নানা বিচিত্র স্বাদে পরিপূর্ণ ছিল, তা নানা জাতীয় রান্না বান্না ও তরি তরকারীর উল্লেখে বোঝা যায়। গণেশমাতা দুর্গার রন্ধনশালায় অবশ্য ভোজনরসিক পরিশীলিত বাঙালির রান্না বান্নার পরিচয় মেলে। দুর্গার রন্ধনশালা পর্বত রাজ্য কৈলাশ নয়, আমাদের বাঙালি হিন্দু গেরস্থের খোড়ো চাল কিংবা তালপাতার ছাউনির কুঁড়ে ঘর, যেখানে - নিম, শিম, বেগুন আর সুকুতার তিত- বড়ই মধুর।

বণিক খণ্ড পরিশীলিত অভিজাত জীবনচর্যার বর্ণনা। বাঙালির উত্তরণের কাহিনী। মধ্যযুগের প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালির বিজয় অভিযানের কথকতা। বাঙালির সংগ্রামের অধ্যায়। নৌবাণিজ্যের সেই গৌরবের দিনে অকুতোভয় ধনপতির নৌবহর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালি সত্তদাগর বাণিজ্য বিনিময় করেছেন, শিল্প বিনিময় করেছেন। বাঙালির বিজয় অভিযানের কাহিনীর মধ্যে মুকুন্দরাম সমকালের শিল্পকে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। বণিকখণ্ডে বহুবিবাহ, সপত্নী কলহ, বণিক রমণীর বৈভব বিলাসের চিত্র ফুটে উঠেছে। মধ্যযুগের বাঙালির নানা সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি কাব্যে ধরা পড়েছে। সর্বোপরি সেকালের বাঙালি রমণীর রন্ধনকলা, সাধ ভক্ষণের মধ্যে ব্যঞ্জনশিল্পের উচ্চতর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। রমণীর অলংকারপ্রিয়তা এবং সৌন্দর্যস্পৃহা বণিকখণ্ডে পূর্ণতা পেয়েছে। আর যুদ্ধ নিপুণ বীর বাঙালি রায়বাঁশিয়া নৃত্যের তালে তালে যে শিল্পশৈলীর নমুনা রেখেছেন, তা পরম

মমত্বের সঙ্গে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। লোকশিল্পকে সাহিত্যিক ধাঁধাঁর মাধ্যমে শিল্প-সুন্দর রূপ দিয়েছেন কবি। বিবাহ, মঙ্গল-অনুষ্ঠান, নবজাতকের জন্ম সময়ে হিন্দুর পালনীয় আচার-প্রথার উল্লেখ আছে কবির কাব্যে। আর জীবনচর্যার এই প্রতি পদক্ষেপে শিল্প ব্যক্তির জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুকুন্দরামের কাব্য লোকশিল্পের ভূস্বর্গ।

সমগ্র মধ্যযুগে লোকশিল্পের উৎস সন্ধানে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তুলনা মেলা ভার। লোকশিল্প কোন বিচ্ছিন্ন শিল্প নয়। এর সঙ্গে মানুষ এবং মাটির যোগ আছে, জাতি এবং বৃত্তির যোগ আছে। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের যোগ আছে। বাস্তব প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য একই সূত্রে আবর্তিত। মুকুন্দরাম নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজ এবং সভ্যতাকে তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। লোকশিল্প তার কাব্যে সমাজ সত্যের স্বাভাবিক নির্যাসরূপে বিধৃত, যা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ।

অনার্য শিল্পের পাশাপাশি আর্যরা ভারতে আসার পর আর্য শিল্পধারার বিস্তার ঘটেছিল। আর্য শিল্পে অলংকরণ এসেছিল। Ananda K. Coomarswamy তাঁর "History of Indian and Indonesian Art" গ্রন্থে লিখেছেন - " The Vedic Aryans were proficient in carpentary, building houses and racing chariots of wood; and in metal work, making vessels of ayas, presumably copper, for domestic and ritual use, and using gold jewellery. They wove, knew sewing and tanning, and made pottery. [.....] In all probability, the early Aryan Art was "decorative", or more accurately, abstract and symbolical; in other words, a northern art in Strzygowski's sense." [১৯]

কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় ও তাদের শিল্প –

কবিকঙ্কণের কাব্যে কেবল জাতি এবং সম্প্রদায়ের নাম উল্লিখিত হয় নি। ব্রাত্য শিল্পীদের শিল্পের উল্লেখ এসেছে কবির কাব্যে। বর্ণনায় এসেছে বাস্তবতা এবং সহানুভূতি। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় অনালোচিত এই শিল্পগুলি হল চুনশিল্প (চুনারি সম্প্রদায়), পান ও পান বোরজ (বারুই সম্প্রদায়), খেঁজুর গুড় (শিউলি সম্প্রদায়),

কাগজ শিল্প (কাগতি সম্প্রদায়) প্রভৃতি। লোকশিল্পে এই সব শিল্পগুলি সমষ্টিগত শিল্প। পল্লীর সমস্ত সম্প্রদায় এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন। অভিজ্ঞতা উত্তরাধিকার এবং ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে দক্ষ শিল্পীরা উঠে আসেন। মৃত শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন প্রস্তুত করা হয়। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বারুই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বোরজ তৈরি করতেন। বারুই ঐতিহ্য চিহ্নিত শিল্পী সম্প্রদায় রূপে বাঙালির জাতিতত্ত্বে থেকে যাবে। আর খেজুর গুড় প্রস্তুতকারী সম্প্রদায় হলেন শিউলি। কাগতিরা কাগজ তৈরি করতেন। শেষ রাত থেকে কাগজি পাড়ায় কাগজের উপকরণ কুটবার আওয়াজ পাওয়া যেতো। ঢেঁকির শব্দ শোনা যেতো। শিল্পীদের ঢেঁকির শব্দ আজ নীরব। বৃত্তি পরিবর্তন এই শিল্পীদের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। একান্তই দূরবর্তী উপকথার মত হারিয়ে গেছেন এই শিল্পীরা।

কাব্যে অনার্য লোকশিল্পরূপে ফাঁদ, সাতনলা, জাল, জালদড়ি, ব্যাঘ্রচর্ম, মৃগছাল, হাড়মালা, মুণ্ডমালা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অনার্য জনজাতিদের বিবাহে পণ বা যৌতুক স্বরূপ সাতনলা, জাল বা ফাঁদ উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হত। ফুল্লরার পিতা সঞ্জমকেতু ফুল্লরার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ কালকেতুকে সাতনলা দিয়েছেন। ব্যাধ নায়ক কালকেতুর শিশুকাল থেকেই জালদড়ির সঙ্গে পরিচয়। অনার্য শিল্পরূপে কাব্যে এসেছে জালদড়ি। ব্যাধেরা জাল দিয়ে অরণ্যে পশু শিকার করে। লোকশিল্প সহজ সরল। অনার্য ব্যাধ শিশুদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত এরকম জাল দড়ি। বর্বর যুগ পরবর্তী মানুষ লজ্জা অনুভব করেছে, সংস্কৃত হয়েছে। গাছের বাকল এবং পশুচর্ম দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। স্ফুরিত হয়েছে সৌন্দর্য চেতনা। অঙ্গাভরণ রূপে বাকল এবং পশুচর্ম ব্যবহার করেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে গড়ে উঠেছে হিন্দু মিথ। শিব দেবতার পরিধেয় আভরণ ব্যাঘ্রচর্ম ও মৃগছাল। আরণ্যক মানুষ জীবনধারণের জন্য পশুর সাহায্য নিয়েছে। দেববাদের সঙ্গে হাড়মালা এবং মুণ্ডমালার মহতী মহিমা আরোপ করা হয়েছে। এসব শিল্প কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। অশুভ শক্তির বিনাশ, কল্যাণ সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা, পৌরাণিক মহিমা আরোপের কারণে হাড়মালা মুণ্ডমালা একাধারে অনার্য শিল্প অপরদিকে শিব ও কালিকার বিশেষ অলংকার রূপেও পরিগণিত। কবিকঙ্কণের কাব্যের দেবখণ্ডে হাড়মালা এবং মুণ্ডমালার উল্লেখ এক অনার্য প্রাচীন সমাজের বিশেষ সময়কে ফুটিয়ে তোলে।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে বিবাহ, সাধভক্ষণ, মন্ত্র প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে নানা লোকাচার পালন করা হয়। দেশে দেশে কালে কালে বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা আচার, রীতি-নীতি, প্রথা-বিশ্বাস ও সংস্কার। কালকেতু শিকার যাত্রার কালে ধনুকে স্বর্ণগোধিকারূপী চণ্ডীকে বেঁধেছেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে নানা লোকশিল্প যৌতুক দেওয়া হয়। এসব মঙ্গল অনুষ্ঠানে কলসীকে মঙ্গল ঘট রূপে পূজা করা হয়। নৌযাত্রার কালে নৌকাকে পূজা করে নানা সংস্কার পালন করা হয়। দেখা যাচ্ছে, সংস্কার ও লোকশিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মধ্যযুগের বাণিজ্য-সমাজ ও অর্থনীতির ধরন-ধারণ মুকুন্দের কাব্যে ফুটে উঠেছে। সেকালে শিল্পের বিনিময়ে শিল্প আনয়নের রীতি মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। এমনকি প্রজন্মের বাবধানেও বাণিজ্য বিনিময়ে তেমন কোন বদল লক্ষ করা যায় না। ‘পাট সোন’ বদলে ‘ধবল চামর’ এবং কাচের বদলে নীলার বিনিময়ের কথা লিখেছেন মুকুন্দরাম। লোকশিল্প জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করেছেন। তিনি সংস্কৃত হতে চেয়েছেন। তার ব্যাধ বৃত্তিতে পরিবর্তন এসেছে। জীবিকা ক্ষেত্রে ঘটে যাচ্ছে পর্বান্তর। তিনি অর্থলাভ করে পত্নী এবং নিজের জন্য শিল্পদ্রব্য কিনেছেন। মুকুট, চন্দন কাঠের পিড়া, হার, চূড়া, বর্ম, ঢাঙ্গি, তলোয়ার, ঢাল প্রভৃতি কিনেছেন।

লোকশিল্প যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আধার হতে পারে মুকুন্দের কাব্যে তার স্বাক্ষর মেলে। লোকশিল্পকে কেন্দ্রভূমিতে রেখে কবি প্রশ্নোত্তর এবং রূপকের মাধ্যমে আশ্চর্য সাহিত্যিক ধাঁধা পাঠককে উপহার দিয়েছেন। উনুন, হুঁকো, শাঁখ প্রভৃতি লোকশিল্পকে অবলম্বন করে কবি ধাঁধাকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। উনুনে আগুন জ্বলে। রন্ধন কার্য সম্পন্ন হয়। উনুনের সুচিতা বজায় রাখা হয়। মাটির তৈরি এমন উনুনে থাকে দুই মুখ। পণ্ডিত কবি মুকুন্দরাম ধাঁধা সৃষ্টির আদর্শ মানদণ্ড তৈরি করেছিলেন। ধাঁধাকে শ্রীমণ্ডিত করে রসসৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন রায়বেঁশে নৃত্যকলার পরিচয় আছে। রায়বেঁশে নৃত্যের সঙ্গে লোকশিল্পের সুনিবিড় সম্পর্ক। রণডঙ্কা এবং ঢোল এই দুই বাদ্যযন্ত্র রায়বেঁশে নৃত্যের আবশ্যিক উপকরণ। ধনপতির সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে এমন

রায়বাঁশিয়া নৃত্যকলার পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। ডোম জাতির সেই নৃত্যকলা একালে হারিয়ে গেছে। বিরঢাক, ডম্বুর, জগঝম্প, শিঙ্গা প্রভৃতি পাইক বাঙালির নানা লোকবাদ্য তথা লোকশিল্প বিবাহ আচারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনার্য বিবাহ অনুষ্ঠানে গোময়ে মাটি লেপে আলপনা দেওয়া ও মণ্ডপ বাঁধার উল্লেখ আছে। ফুল্লরার পিতা কালকেতুকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দিয়েছেন ধনুক এবং বাণ। বিবাহে শঙ্খ, চামর, দর্পণ এবং নানা লোকবাদ্যের ব্যবহার হয়। আর্য বিবাহে প্রাগ্রসর বণিক সমাজের নানা লোকশিল্প যৌতুক উপকরণরূপে উল্লিখিত হয়েছে। সুতা, নাটাই, তির, ধনুক বিবাহের যৌতুক সামগ্রীরূপে কাব্যে এসেছে। সাধভক্ষণের কালে ব্যাধ সমাজে অনার্য রীতি-নীতি পালনের সঙ্গে অনার্য রন্ধনের পরিচয় দিয়েছেন মুকুন্দরাম। নিদয়া সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান কালে খেয়েছেন মহিষের দই, ঘোল, ফুলবড়ি, নেউল-গোধিকা পোড়া, চিঙড়ির বোড়া প্রভৃতি। প্রসব করানোর জন্য লোকসমাজে মন্ত্রপূত ঔষধের সন্ধান করানো হয়। রমণীর সাধভক্ষণ কালে অনার্য আচারের থেকে আর্য আচার কিছুটা ভিন্নতর, শীলিত। খুল্লনা সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানে ঘোলে মেশানো লাউ, দুধ, তিল ও গুড় মেশানো জাউ খেয়েছেন। লহনা খুল্লনার জন্য রান্না করেছেন রুই মাছ, কুমড়া বড়ি, আলুর ঝোল এবং পুঁটি মাছ ভাজা। কবিকঙ্কণের কাব্যে মন্ত্র ও জাদুর উল্লেখ আছে। লহনা মন্ত্র ও ওষুধির সাহায্যে হারিয়ে যাওয়া যৌবন ফিরে পেতে চান। লোকশিল্প হল সেই উপকরণ – যার মাধ্যমে মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। ওষুধি প্রস্তুতিতে মন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন লীলাবতী। মন্ত্রের জন্য আলপনা অঙ্কন করা হয়েছে। চুন ও পানের ব্যবহারও মন্ত্রের প্রয়োজনে কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। লোকসমাজে নানাবিধ সংস্কার পালন করা হয়। জন্মমুহূর্তে, বিবাহে, মৃত্যু ও যাত্রাকালীন সময়ে, অনুষ্ঠানে সংস্কার পালিত হয়। বারব্রত, রীতি-নীতি, সংস্কার পালনের সময়ে বিভিন্ন লোকশিল্পের ব্যবহার হয়।

লোকশিল্পের উল্লেখ এসেছে এই নৃত্যে। ষোড়শ শতকের এক সামাজিক পটভূমিতে লোকশিল্পের বিশেষ পরিমণ্ডল কাব্যরূপ দিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের কবি। একালের গবেষকের কাছে তা এক মহতী প্রাপ্তি। পরিশেষে বলতে হয়, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য জাতি, বৃত্তি, সম্প্রদায়, শিল্পী ও শিল্পের আদর্শ গবেষণার ক্ষেত্র। অনার্য-আর্য শিল্প সংস্কৃতি, বিবাহ, সাধভক্ষণ, মন্ত্র, লোকাচার, সংস্কার, বাণিজ্য, সমাজ, জীবনযাত্রা, অর্থনীতি সমস্ত ক্ষেত্রেই লোকশিল্প নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সংস্কৃতির নানা

ক্ষেত্রকে প্রবর্ধমান করে রেখেছে। মধ্যযুগে সভ্যতার ভিত্তি ছিল লোকশিল্প। লোকশিল্প দিয়ে কবি সাহিত্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। রায়বেঁশে নৃত্যের সঙ্গে শিল্পকলার গভীর যোগ। মানুষের প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যের মেল বন্ধন ঘটিয়েছে এই শিল্প। মুকুন্দের কাব্যে আলো-আঁধারি বাতায়ন দিয়ে লোকশিল্পের সেই অতীত গৌরবের রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভূমিকে দেখতে পাচ্ছেন আধুনিক পাঠক। কবিকঙ্কণের কাব্য অবলম্বনে উপরিউক্ত বিষয় প্রস্তাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হল -

চুনশিল্প : চুনারি সম্প্রদায় - চুন এক প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্প। চুন প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়ের নাম 'চুনারি'। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'চুনারি' সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। H.H. Risley (Herbert Hope Risley) তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন—

" Chunaru or chundri, chunafarosh lime – burners, or workers in lime, as plasterers; a vendor of lime; also a synonym for Baiti."[২০]

নিম্নবর্গীয় এই শিল্পী সম্প্রদায় শামুক বা ঝিনুক থেকে চুন প্রস্তুত করেন। এখন বাংলাদেশে এই বৃত্তিজীবী মানুষের দেখা পাওয়া ভার। বৃত্তি পরিবর্তন এই সম্প্রদায়ের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। আষাঢ় মাসে মাঠ ঘাট ডুবে যায়। থৈ-থৈ জলে ভরে যায় পুকুর ঘাট। এরকম নববর্ষায় মাটির গভীর থেকে বড় শামুক মাঠ জুড়ে দেখা যায়। এমন ভরা বর্ষায় মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে এমন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ শামুক ধরে এক স্থানে জড় করে। তারপর গরম জল ঢেলে জীবিত শামুককে মেরে ফেলা হয়। এই মৃত শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন প্রস্তুত করা হয়। এককালে চুনের প্রয়োজনীতা ছিল অশেষ। বিশেষত বাঙালির আতিথেয়তায় পানের ব্যবহার অনস্বীকার্য। চুন দিয়ে পান প্রস্তুত করা হয়। একালে পানের ব্যবহার কমে এসেছে। 'চুনারি' সম্প্রদায়েরও একালে দেখা মেলে না।

কবিকঙ্কণের কাব্যে পদাতিক সৈন্যদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। পদাতিক সৈন্য (পাইক) যুদ্ধে যাওয়ার সময় কপালে চুনের ফোঁটা কপালে পরতেন। শ্রীমন্তের যুদ্ধ যাত্রার সময় পদাতিক সৈন্য কপালে চুনের ফোঁটা দিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছেন। কবিকঙ্কণ এমন যুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর কাব্যে—

"রণসিংহ রণভীম ধায় রণসাটা

তিনভাই তির বেন্ধে দিআ চুনের ফোঁটা"। (২১)

কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে চুনারি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করতে ভোলেন নি। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুনারিরাও গুজরাট নগরে বসতি স্থাপন করেছেন। কবি লিখেছেন—

"চৌদুলি চুনারি মাঝি কোরঙ্গা দেখায় বাজি

মাল বৈসে পুরের বাহিরে"। (২২)

কবিকঙ্কণের কাব্যে মধ্যযুগের হাটের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের হাট লোকসংস্কৃতির চিহ্ন বহন করে। হাটে নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়। লক্ষণীয়, কবিকঙ্কণের কাব্যে নির্দিষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষ নির্দিষ্ট শিল্পের সঙ্গে অন্বিত হতে দেখা গেছে। গুজরাট নগর পত্তনের পর বৃত্তিজীবী মানুষ শিল্প সৃষ্টি করেছে। কাব্যে ঠিক তার পরেই এসেছে হাট। হাটে নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়। কবিকঙ্কণ তৈল, ভক্ষ দ্রব্য, উপহার কেনাবেচার উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের হাটও গণতান্ত্রিক। নানা বৃত্তিজীবী মানুষের ভিড়। হাটে এসেছে হাটুয়া, বেরুনিঞা জন (শ্রমিক শিল্পী), এমন হাটে বিচিত্র মানুষের ভিড়। কবিকঙ্কণ চুনের উল্লেখ করেছেন। কবি লিখেছেন—'পিঠে চুন মাখিআ হাটুআ চলিল আর্দাসে'। (২৩)

কায়স্থ ভাড়ুদত্ত হাটকে লণ্ডভণ্ড করে তোলে। জোর করে হাটুয়াকে মারধোর করে। চুল ধরে হাটুয়াকে কিল চড় লাথি মেরে পিঠে চুন মাখিয়ে দেয়। ভাঁড়ুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ লোকশিল্পী সমাজ কালকেতুর কাছে অভিযোগ জানায়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

'মহাবীর রাজ্য কর ভাড়ু দত্ত লইআ

হের দেখ পিঠে চুন ভাড়ু দত্ত করে খুন

সভে জাইব বিদায় হইআ'। (২৪)

ব্যক্তিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য মুখে চুন কালি মাখানো হত। চুন অমর্যাদার প্রতীকরূপ। কবি চুনকে ব্যঞ্জিত করেছেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে এসেছে সেই হারিয়ে যাওয়া চুনারি সম্প্রদায়।

পান - বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে একটি রীতি জড়িয়ে ছিল, তা হল পান খাওয়া। মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে পানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। শীলিত বাঙালি পরিবারের অতিথি এবং সদস্যরা খাওয়া শেষ করে মুখ ধুয়ে পান খেতেন। পরে গৃহিণী এবং অন্য রমণীরাও আহারান্তে পান খেতেন। রমণীরা বাটায় পান সাজতেন। অতিথি আপ্যায়নে বাঙালি পরিবারে পানের ব্যবহার আবশ্যক ছিল। এছাড়া বিবাহ, কর্মবাড়ি, অনুষ্ঠানবাড়ি এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে পান খাওয়ার রীতির প্রচলন ছিল।

আখেটিক খণ্ডে ভাঁড়ু দত্ত গুজরাটে বসতি স্থাপনকারী বৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষদের নিয়তই বিব্রত করেছেন। পয়সা না দিয়ে নিয়েছেন গুয়াপান—'গুয়া পান নিত্য লয় ঠেঠা'। (২৫)

বণিক খণ্ডে নায়িকা খুল্লনা আহারান্তে পান খেয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"ভোজন করিআ সাঙ্গ কইল আচমন

কর্পূরতাম্বুল কইল মুখের শোধন"। (২৬)

রন্ধনপটু খুল্লনা নানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন। অতিথিকে আহ্বান করেছেন ধনপতি। আহারান্তে তারা তাম্বুল গ্রহণ করে বিদায় নিয়েছে—

"সমপি ভোজন তারা করিল বিদায়।

তাম্বুল বসন হেম সাধু গৃহে পায়"।। (২৭)

শুধু দুপুরের আহার নয়, রাত্রিকালেও আহারান্তে পান খাওয়া আবশ্যক ছিল। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"ভোজন সঙ্কলি আঁচমন কূতুহলে।

কর্পূরতাম্বুল খায় হাসে খলে খলে"।। (২৮)

বণিক খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, সেকালে অভিজাত বণিকদের শয়নকক্ষে থাকত পাখা, পান এবং জলপাত্র। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"বাটা র‍্যা পান গুয়া সুগন্ধি চন্দন চুয়া

কর্পূর লবঙ্গ তোলা লেখা"। [২৯]

পান চাষিদের বলে বারুই। বারুই বাংলার বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়। পানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির নানা লোকাচার। পান সাজার নানা উপকরণ পল্লী রমণীর নিজস্ব সামগ্রী ছিল। জাঁতি, পিকদানি, ডিবা, পানের বাটা, ডাবর, চুনাতি কারুকার্য শোভিত করা হত। সেকালের সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ীতেও এগুলি শোভা পেত। অতিথি আপ্যায়নে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে পানের ব্যবহার ছিল। হিন্দুদের দেব দেবীর পুজোতে দেবতাকে অর্ঘ্যরূপে পান দেওয়া হত। ব্রাহ্মণকে গৃহস্থ পান দান করতেন পুণ্য অর্জনের আশায়। হিন্দু বিবাহের সময় পান দিয়ে পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ পরস্পর আত্মীয়তা স্থাপন করতেন। হিন্দুদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পান দেওয়ার রীতি রয়েছে। বাঙালির গৃহে অতিথি আপ্যায়নে বিশেষত খাওয়ার পরে পান দিয়ে নমস্কার করে অতিথিকে বিদেয় করা হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লহনা খুল্লনা স্বামী সম্ভাষণে এবং ভোজনান্তে পান দিয়ে ধনপতিকে তুষ্ট করেছে। পান তৈরি এক বিশিষ্ট শিল্পকলা। পানের সাজ এখন আর নেই। সেই পরিবেশের স্মৃতি একালের প্রবীণ মানুষদের বিষণ্ণ করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের 'ছেলেবেলা' প্রবন্ধে লিখেছেন—"কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম'। [৩০]

পানের বোরজ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সেকালের সমাজ সন্ধানের আদর্শ ক্ষেত্র। জাতিবৃত্তি সম্প্রদায়ের বৃহত্তর চিত্রমালা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। পান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। মধ্যযুগে পান সৌখিন অভিজাত বনেদিয়ানার অংশ ছিল। অতিথিপ্রিয় বাঙালির অতিথি অভ্যর্থনা সুবিদিত। পল্লীর গৃহকোণ রমণীয় হয়ে থাকত রমণীর কোমল আন্তরিক আত্মীয়প্রিয়তার ঔদার্যে। শুধু গৃহবধূর কোমল করস্পর্শই নয়, সেকালের ঠাকুরমা-দিদিমারাও পল্লী পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তারা নিজের হাতে পান তৈরি করতেন, পান সাজাতেন, বাটায় যত্ন করে রাখতেন।

সাহিত্যে পানের উল্লেখ থাকলেও পান বোরোজের বিশেষ উল্লেখ নেই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই পান বোরোজের নির্মাণের প্রসঙ্গ আছে। লোকশিল্প এক বিশেষ পরিবেশের, বিশেষ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি। লোকায়ত মানুষই এই শিল্পের স্রষ্টা, রক্ষক এবং বাহক। মধ্যযুগের বাংলায় বৃত্তি এবং সম্প্রদায় ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। এক বিশেষ বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় বোরজ নির্মাণ করতেন। বারুই সম্প্রদায়ের মানুষ এই শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত। H.H. Risley (Herbert Hope Risley) তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন—

"Barui, Barai,' the names of the two Castes engaged in Bengal and Behar, respectively, in the cultivation of piper betal, ordinarily known as pan (Sansk, parna) the leaf par excellence." (৩১)

বারুই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যগত বৃত্তি হল বোরজ তৈরি। বংশ পরম্পরায় এই সম্প্রদায়ের মানুষ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছে। H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে পান চাষ এবং বোরজ নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। বোরজ তৈরির জন্য জমি নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য বরাবর জমির জায়গা চিহ্নিত করা হয়। বোরজের প্রবেশ পথ থাকে পূব-পশ্চিমে। সাধারণত বোরজ ঘরের উচ্চতা হয় আট ফুট। হিজল গাছের কাণ্ড বা সুপারি গাছের কাণ্ড বা বাঁশের সাহায্যে বোরজ বাড়িকে দাঁড় করানো হয়। পাট কাঠির ছাউনি, খড় এবং জুন ঘাস দিয়ে বোরজ বাড়িতে সামান্য ছায়া তৈরি করা হয়। তীব্র সূর্যরশ্মিকে প্রতিহত করে এক আলো আঁধারি মায়াময় পরিবেশে বোরজবাড়ীতে পান গাছের চারা পোতা হয়। পান গাছের লতানো নরম চারাকে পাট কাঠির সাহায্যে দাঁড় করিয়ে জুন ঘাস দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। বাগানে ঢোকার জন্য গাছের সারির পাশেপাশে সরু নিচু রাস্তা তৈরি করা হয়। সমতল থেকে সামান্য উঁচুতে পান বাড়ি তৈরি হয়। অতিবৃষ্টির জল যাতে না জমে তার জন্য ড্রেন তৈরি করে জলনিকাশির ব্যবস্থা করা হয়। H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন— "A sloping footpath, leads down the centre of the enclosure, towards which the furrows between the plants trend, and serves to drain off rain as it falls, it

being essential for the healthy growth of the plant that the ground be kept dry." (৩২)

পান গাছের নিয়মিত যত্ন নিতে হয়। নিয়মিত পান চারাকে কাঁচি দিয়ে কেটে রাখতে হয়। পান চারার মাটি প্রস্তুত করাতেও এক চমৎকার শৈল্পিক সুষমার পরিচয় মেলে। একটি কৃষি বিষয়ক ছড়ায় পাওয়া যাচ্ছে—

'মুলার মাটি ধুলা

তার অর্ধেক তুলা

তার অর্ধেক পান

তার অর্ধেক ধান'।

পানের মাটিকে অনেক যত্ন করে গুড়ো করতে হয়।

H.H. Risley তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন— " The pan plant is propagated by cuttings, and the only manures used are pak-mati, or decomposed vegetable mould excavated from tanks and khali, the refuse of oil-mills." (৩৩)

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু গুজরাট নগর গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। আদর্শ পল্লীর ভাবনা, নগর পত্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি, সেকালের বহু বৃত্তিজীবী মানুষ এবং সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে এমন নগরে। মুকুন্দরাম লিখেছেন—

"বারুই নিবসে পুরে বোরজ নির্মাণ করে

মহাবীরে নিত্য দেই পান"। (৩৪)

বোরজ বারুই সম্প্রদায়ের একক বৃত্তি আর নয়। ভেঙে গেছে এমন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রকৌশল। বদলেছে একালের বাঙালির অতিথিপ্রিয়তার ধরন। একালের বাঙালি পরিবারে অতিথি আপ্যায়নে বাটায় ভরে পান দেওয়ার রীতি প্রায় উঠে গেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ বোরজ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হয়তো

"বারুই" ঐতিহ্য চিহ্নিত শিল্পী সম্প্রদায়রূপে বাঙালির জাতিতত্ত্বে থেকে যাবে। তাই বারুইদের বৃত্তি পরিবর্তন স্বাভাবিক। H.H. Risley তাঁর গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন— ".....The bulk of the caste, however, follow their traditional occupation. Betel cultivation is a highly specialised business, demanding considerable knowledge and extreme care to rere so delicate a plant." (৩৫)

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে বারুই সম্প্রদায় এবং তাদের নির্মিত বোরজের উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—'বারই বরুজে জেন নিছিআ পেল পান"। (৩৬)

যারা পান চাষ করেন তাদের বলা হয় বারুই। বারুই বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়। অস্ট্রিক ভাষায় পানকে তাম্বুল বলা হয়। আর যারা পান ব্যবসায়ী জাতি তাদের বলা হয় তাম্বুলিক। বাংলাদেশে তামলি পদবীধারী সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের একটি খণ্ডের নাম তাম্বুলখণ্ড। সেকালে কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর সময় মায়ের হৃদয় ব্যাকুল হত। পানের বোরজে গিয়ে পানপাতাকে ধূপ দীপ দিয়ে বন্দনা করে জননী কন্যার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। কন্যা যেন জামাতার মুখের তাম্বুল হয়ে থাকেন।

পান নিয়ে লোকায়ত সংস্কারও অনেক। পান তোলার পরে পানের বিড়া পুকুরের জলে ধোয়া হয়। আর তার আগে পুকুরের জলে একটি পান ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এটি গঙ্গাদেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত পান। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী লোকশিল্পীর সন্ধান পাওয়া যেত। গ্রামের শিল্পীরা গ্রামের মানুষদের জন্যই শিল্প সৃষ্টি করতেন। কামারেরা ঘরের কামারশালে লাঙল তৈরি করতেন। তাঁতি তৈরি করতেন কাপড়, গ্রামের স্বর্ণকার অলংকার প্রস্তুত করতেন। আর বারুই তৈরি করতেন বোরজ। তেমনি তামলি বানাতেন পান। জীবনের প্রয়োজনে এমন সূক্ষ্ম শিল্প সমগ্র সমাজদেহের অংশ ছিল। গ্রামীণ পরিবেশে শিল্প ছিল সৌন্দর্যের সারাৎসার। একালে পানের সে দিন আর নেই। সেই পল্লী জীবনের বিশিষ্ট মমতা রসে সিক্ত আপ্যায়নের রীতি হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির অংশ। R.V. Russell তাঁর 'The Tribes and Castes

of the Central Provinces of India' Volume – 1, গ্রন্থে লিখেছেন—"Mali may be classed the Barai, the grower and seller of the pan or betel-vine-leaf. This leaf, growing on a kind of creeper, like the vine, in irrigated gardens roofed with thatch for protection from the sun, is very highly prized by the Hindus. It is offered with areca–nut, cloves, cardamom and lime rolled up in a Quid to the guests at all social functions. " (৩৭)

খেঁজুর গুড় : শিউলী সম্প্রদায়ের চিরন্তন শিল্পকর্ম - বাংলাদেশ গাছ-গাছালির দেশ, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। বাংলাদেশ তাল খেঁজুরের দেশ। খেঁজুর রস এবং খেঁজুর গুড় আস্বাদপিপাসু বাঙালির রসনাকে তৃপ্ত করেছে সেই আবহমান কাল থেকে। বিশেষ একটি সম্প্রদায় খেঁজুর গুড় তৈরি করেন। এই সম্প্রদায় 'শিউলী' নামে পরিচিত।

খেঁজুর গাছ থেকে খেঁজুর রস সংগ্রহ করেন শিউলীরা। রস সংগ্রহের আদর্শ সময় শীতকাল। খেঁজুর রস সংগ্রহের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। শীতকালের শুরুতে শিউলীরা খেঁজুর গাছে উঠেন। গাছের শুকনো ডাল, পাতা কাটা নিচের অংশ যাকে 'কুবা' বলে, তা কেটে পাতার নিচের অংশ একটু একটু করে চাঁচতে শুরু করেন। কয়েকদিন ধরে পর্যায়ক্রমে শিউলীরা এই চাঁচার কাজটি করেন। এইভাবে গাছের নরম সাদা অংশ ধারালো হাঁসুয়ার সাহায্যে চেঁছে বের করেন। ঐ অংশ থেকে খেঁজুর রস ঝরে। সেই রস যাতে গোটা গাছে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য শৈল্পিকভাবে ইউ 'U' আকৃতিতে গভীরভাবে দাগ করে চেঁছে দেন শিউলীরা। গাছের রস নির্দিষ্ট কলসীতে পড়ার জন্য একটি বাঁশের চুঙি দেওয়া হয়। শিউলী ঐ কলসীর দড়ি চুঙির সঙ্গে বেঁধে দেন। চাঁছা অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস চুঁইয়ে কলসীতে পড়ে। খেঁজুর গাছে ওঠার সময় শিউলীরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। এবড়ো খেবড়ো কুবা বেয়ে গাছে উঠতে হয়। প্রথমে বাঁশকে গাছের সঙ্গে বেঁধে, কোমরে দড়ি বেড় দিয়ে, গাছের সঙ্গে সমগ্র শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে, ধারালো হাঁসুয়ার সাহায্য নিয়ে নিয়মিত গাছ চাঁছতে হয়। হাঁসুয়ায় তীক্ষ্ণ ধার দেওয়ার জন্য সরু বালি রেখে পাষাণে শান দিয়ে ধার তোলা হয়। সাধারণত প্রতিদিন বিকেলে গাছ চেঁছে দেন শিউলীরা। সারারাত চুইয়ে চুইয়ে

ফোঁটা ফোঁটা খেজুরের রস ঝরে ঝরে মাটির কলস ভর্তি হয়। সকালে শিউলীরা অত্যন্ত সাবধানে খেঁজুর রস ভর্তি কলস নামিয়ে নেন।

"কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,

খেজুর পাতার ফাঁস করে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।

সেদিন হইতে খেজুর বাগানে নীরবে অনর্গল

সারারাত ধরে খেজুর গাছের দুই চোখে ঝরে জল।

শিউলিরা ভোরে সংগ্রহ করে ভাঁড় ভরা মিঠে রস,

দিক হ'তে দিকে ছড়ায়ে পড়িল খেজুর গাছের যশ।

খেঁজুর পাতারই জ্বালে,

খেজুর তলায় বসে রস মেড়ে গাগরীতে গুড় ঢালে"। (৩৮)

এরপর উনুনে জ্বাল দিয়ে খেজুর গুড় তৈরি করেন শিউলীরা। জ্বালানির বিভিন্ন মাত্রা এবং পাকে বিভিন্ন রকমের গুড় বা পাটালি তৈরি করেন শিউলী। পাটালিতে নানা নকসা এবং কারুকার্য অঙ্কন করেন শিউলীরা। একালের খেঁজুর গুড়ের এই শিল্পটি প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খেঁজুর গুড়ের উল্লেখ এসেছে। কালকেতুর গুজরাট নগরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত শিউলীরাও বসতি স্থাপন করেছেন। শিউলীরা গুড় প্রস্তুত করছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"শিউলি নিবসে পুরে খাজুর কাটিআ ফিরে

গুড় করে বিবিধ বিধানে"। (৩৯)

এছাড়া ভাঁড়ুর অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ভাঁড়ুর নিকট আত্মীয়রা ছিলেন দুর্দান্ত। তারা ময়রার গুড় লুট করতো। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"তার বেটা বড় হুড় ময়রার লুটে গুড়

নিবেদিতে নাহীক স্বহায়"। [৪০]

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে শিউলী সম্প্রদায়ের মানুষেরা খেঁজুর এবং তাল গাছের রস থেকে গুড় প্রস্তুত করতেন। শীতকালে খেজুরগুড় এবং গরমের শুরু থেকে তালগুড় প্রস্তুত করতেন। H. H. Risley (Herbert Hope Risley) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন— "Of the Hughli sub-castes, the Saro are agriculturists, the Siuli extract the juice of date and palm-trees". [৪১]

এই শিউলী সম্প্রদায় একালে প্রায় হারিয়ে গেছে। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেই প্রায় বিলুপ্ত সম্প্রদায়ের লোকশিল্পকে চিহ্নিত করে গেছেন তার সৃষ্টিতে।

কাগজ শিল্প : কাগতি সম্প্রদায় : কাগতি বা কাগজি সম্প্রদায়ের মানুষেরা একসময় কাগজ তৈরি করতেন। পুরানো কাগজের মণ্ড বা পাটের মণ্ড দিয়ে কাগজ তৈরি হত। এক মন কাগজের সঙ্গে পাঁচ কেজি পাট মেশানো হত। বাজে কাগজ বা ছাট কাগজ বা ছেঁড়া কাগজ জলে ভিজিয়ে রাখা হত। আর উচ্চমানের মিহি পাট চূর্ণ করে জলে ভিজিয়ে কাগজ বা পাটের মণ্ড তৈরি করা হত। অবশ্য সেকালে শুধু পাটের সাহায্যে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হত। জলে ভিজিয়ে রাখা পাটকে রোদে শুকিয়ে গুড়ো করা হয়। এরপর আবার ভিজিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাখানো ময়দার রূপ দেওয়া হত। পরে জলে ধুয়ে কাগজের মাড় দূর করা হত। মাড়ের সময় কাগজি কাপড়ের এক অংশ নিজের কাপড়ে বেঁধে রাখতেন। এরপর একটা বড় জালায় কাগজের মণ্ড রাখা হত। জালাটি মাটি খুঁড়ে পোতা থাকত। জালার ভেতর চালুনি ডুবিয়ে যে পাতলা সর পাওয়া যেত, তাই হল কাগজ। এই ভিজে স্তরের এক একটি কাগজ টিনে রেখে রোদে শুকাতে হয়। সুতরাং বর্ষাকালে কাগজ তৈরি হয় না। এরপর ছুরি দিয়ে কাগজকে কেটে সমান করে শুকতে দেওয়া হয়। শুকনো কাগজে আতপ চালের গুড়ো দিয়ে নারকেল ছোবড়ার সাহায্যে ঘসে মাড় দিয়ে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা হয়। একে বলে কলপ। কলপের পালিশ হলে কাগজ প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয়। এই প্রস্তুত কাগজে রঙ, তেঁতুল বিচির আঁঠা দিয়ে বিভিন্ন রকমের কাগজ প্রস্তুত করা হয়। সেকালের এক একটি গ্রাম ছিল সম্পূর্ণ।

সাধারণত ঘরের বাহির উঠোনে গাছতলায় কাগজ প্রস্তুত করা হত। এক একটি পাড়া, পল্লী বা গ্রাম ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ শিল্পের কারখানা ঘর। শিল্পীরা তাদের শরীর, শ্রম, মনন ও কৌশল দিয়ে কাগজ প্রস্তুত করতেন। ঐতিহ্য এবং বংশ পরম্পরায় অধিগত অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টি কৌশল কাগজ তৈরির প্রধান সহায়।

কাগতিরা হারিয়ে গেছে। তারা বৃত্তি পরিবর্তন করেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিল্পীরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত তাঁর "আড়িয়লের কাগজ" প্রবন্ধে লিখেছেন—"বড় বড় কারখানা হইতে বহু পরিমাণে নানাদ্রব্য আমদানি হওয়াতে যেমন অনেক কুটির শিল্প বিনষ্ট হইয়াছে এই কুটির শিল্পও তেমনি বালি, শ্রীরামপুর, টিটাগড়, রানিগঞ্জ প্রভৃতি মিলের কাগজের প্রচলন হওয়াতে বিনষ্ট হইয়াছে। [.....] বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, শেষরাত্রি হইতেই কাগ্‌জিপাড়ায় ঢেঁকিতে কাগজের উপকরণ কুটিবার আওয়াজ পাওয়া যাইত। দু-তিন মাইল দূরের গ্রামের লোকেরাও ঢেঁকির শব্দ শুনিতে পাইত। সেই ঢেঁকি আজ একেবারে নীরব!"। [৪২]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পীদের শিল্প পরিচয় দিয়েছেন কবি। নগর পত্তনের কালে নানা সম্প্রদায়ের বাসভূমি হয়ে উঠেছে গুজরাট নগর। এই দরিদ্র মুসলমান শিল্পীরা গুজরাটে এসেছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন—

"কাগজ কুটিআ নাম বলায় কাগতি"। [৪৩]

একসময় বহু শিল্পী পরিবার এই শিল্পকে অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করতেন। নানা রঙিন কাগজপত্র, দেবদেবীর মূর্তি সম্বলিত কাগজ, পুঁথি, হিসাবের দোকানের খাতা, দলিল প্রভৃতিতে সেকালে হাতে তৈরি কাগজই ব্যবহৃত হত। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত তাঁর "আড়িয়ালের কাগজ" প্রবন্ধে লিখেছেন—"বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে এই ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল ছিল। তার পর হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং সকলে অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কাগজিরা এখন দপ্তরি, দরজি, দোকানদার, নৌকার মাঝি, চাষি হইয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে। লৌহজঙ্গ, তালতলা বন্দরে এবং এতদঞ্চলে যে সব নৌকার মাঝি দেখা যায়, তাহাদের

ভিতর অনেকেই কাগজি। [.....] এই ধরনের কাগজেই একদিন মোঘল বা কাংড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে- তখন কাগজ বিদেশ হইতে আসে নাই"। (৪৪)

অনার্য লোকশিল্প : পণ, যৌতুক ও বিবাহ : মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনার্য লোকশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতু একজন ব্যাধ যুবক। আরণ্যক সাঁওতাল জনজাতি সম্প্রদায় মূলত শিকারজীবী। শিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ সাতনলা ও জাল। আরণ্যক অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের শিকারীরা সাতনলা দিয়ে পাখি শিকার করেন। নলাকৃতি বাঁশের সাতটি খণ্ডকে জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ করে তোলা হয়। সাতনলার শীর্ষদেশে থাকে তীক্ষ্ণ শলাকা। সাতনলার এই অগ্রভাগের শলাকাই পাখিকে বিদ্ধ করে মাটিতে নামিয়ে আনে। অনার্য আরণ্যক জনজাতি যুবকেরা জাল, দড়ি এবং শিকারকে কৌশলে বন্দি করে ফেলে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে সাতনলা ও জালের উল্লেখ এসেছে। অনার্য জনজাতিদের বিবাহে পণ বা যৌতুক হিসাবে সাতনলা, জাল ও ফাঁদ উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হয়। কালকেতু এবং ফুল্লরার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ ফুল্লরার পিতা সঞ্জমকেতু কন্যাদান করেছেন সাতনলা ও জাল দিয়ে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"বৈবাহিক চরণে পড়ি ব্যেবহার কৈল বাড়ি

সাতনলা জাল আঠা ফান্দে"। (৪৫)

সাতনলা, জাল এবং ফাঁদ দিয়ে পাখি শিকারের পূর্ণতর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবিকঙ্কণ বণিক খণ্ডে। উজানি নগরের বাসিন্দা খগান্তক এবং মৃগান্তক এই দুই যমান্তক ব্যাধ ভ্রাতৃদ্বয় পাখি শিকার করেছেন এভাবে—

"প্রভাতে কাননে চলে জাল ফাঁদ সাতনলে

বিহঙ্গম বধে রাশি রাশি

করে ধরি ধনু-শর ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর

প্রাণি বধে বিবিধ প্রবন্ধে

.....

উর্দ্ধ মুখে কপিঞ্জলে বিন্ধে ব্যাধ সাতনলে

বগড়ি বিন্ধয়ে চকোরকে

.....

হয়পুচ্ছ লোম ফাঁন্দে কত সামুখোলে বান্ধে

দলপিপি সরাল বাদুর"। [৪৬]

বণিক খণ্ডে ধনপতির অবর্তমানে, লহনার অত্যাচারে অস্থির হয়েছেন খুল্লনা। তার এমন অসহায়তার জন্য সারি-শুককে দায়ী করছেন তিনি। সাতনলা এবং ফাঁদ দিয়ে বন্দি করতে চাইছেন পক্ষী দম্পতিকে। সাতনলা এবং ফাঁদ কবির কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে—

"শিখিআ ব্যাধের কলা করে ধরি সাতনলা

কাননে এড়িব জাল ফাঁন্দে"। [৪৭]

পরিশীলিত বণিক রমণীর চোখে অনার্য মানুষেরা ধরা পড়েছে খুল্লনার কথায়। ইতিহাসের ধারাপাতে আর্য-অনার্যের সমন্বয় ঘটেছিল কিন্তু পূর্ণ মিলন হয়নি। ইতিহাসের এক দূরবর্তী অনুদারতা অপ্রশস্ত নির্মাণ দিয়েছিল আর্য-অনার্যের সমন্বয়ে। পরবর্তী সময়ে এই অপূর্ণতা সামাজিক স্থিতি পেয়েছিল। কাব্যে খুল্লনার ব্যাধের ব্যাধবৃত্তি শেখার মধ্য দিয়ে চমৎকার কাব্যপ্রকৌশল সৃষ্টি করেছেন কবিকঙ্কণ। কোল, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল এই সমস্ত অনার্য উপজাতিরা ইতিহাসের এক বড় অধ্যায়। কবিকঙ্কণ এই অপাংক্তেয় জনজাতির জীবন এবং শিল্পকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। R. V. Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of The Central Provinces of India' (Volume – 1) গ্রন্থে লিখেছেন – "One large group includes the Kol, Munda or Ho tribe itself and the Bhumij and santals, who appear to be local branches of the Kols called by separate names by the Hindus." [৪৮]

অনার্য লোকশিল্প ও সংস্কার

লোকশিল্প সরল, লোকায়ত মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই সহজ, অনাড়ম্বর, বাহুল্য বর্জিত। সুতো এবং দড়ির ব্যবহার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই করেছে। দড়ি দিয়ে জাল বুনেছে, ফাঁদ তৈরি করেছে। জেলেরা নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরেছে। আরণ্যক শিকারজীবী মানুষ শুধু তীর, ধনুক, বল্লম দিয়ে শিকার করে নি, জাল এবং ফাঁদের সাহায্য নিয়েছে। কৌশলে, বুদ্ধি প্রয়োগ করে অরণ্যে পশুশিকার করেছে আরণ্যক ব্যাধেরা।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জাল, দড়ি এবং ফাঁদের উল্লেখ অনেকবার এসেছে। এই লোকশিল্প প্রধানত অষ্ট্রিক শিল্পরূপে কাব্যে এসেছে। অনার্য ব্যাধ শিশুদের ছোটবেলা থেকেই জাল এবং দড়ির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠা প্রসঙ্গে লিখেছেন –

"পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের দড়ি

শিশুমাঝে জেমন মণ্ডল"।[৪৯]

অনার্য বিবাহে কুটুমের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষার্থে এবং যৌতুক দান সামগ্রীরূপে জাল আঁঠা এবং ফাঁদ দেওয়া হত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন –

'বৈবাহিক চরণে পড়ি ব্যেবহার কৈল বাড়ি

সাতনলা জাল আঠা ফান্দে।' [৫০]

অরণ্যে পশুরাজ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কালকেতু। কালকেতুর আনাগোনার প্রতি পশুরাজের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। কালকেতুর শিরে জালদড়ি বাঁধা থাকে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'শিরে বান্ধে জালদড়ি কানে ফটিকের কড়ি

মহাবনে করিল পয়ান'।[৫১]

কালকেতু বাগুরা দড়া (ফাঁদ বিশেষ) বা জাল ফাঁদ দিয়ে অরণ্যে হরিণ শিকার করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

‘পাতিআ বাগুরা-দড়া আগলে বনের সুড়া

কাননে করিল মহামার

হাতে গণ্ডি ফিরে কালকেতু

জাল ফাঁদ বনে আড়ি ঝোপে ঝাড়ে মারে বাড়ি

মৃগবধ করিবার হেতু’। (৫২)

সেকালে যাত্রার সময় স্বর্ণগোধিকা বা গোসাপ দেখা অশুভ বলে বিবেচিত হত। সেকালের যাত্রা সম্পর্কিত সংস্কার উল্লিখিত হয়েছে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। গোধিকা দেখে কালকেতু তর্জন করেছেন। জাল দড়ি দিয়ে গোধিকাকে বেঁধেছেন। পুড়িয়ে খাওয়ার বাসনা করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

‘বাঁধিল গোধিকা বীর জাল দড়ি দিআ’। (৫৩)

এমন ব্যাধের জালে বন্দী হয়ে দেবী চণ্ডীও ভীত হয়েছেন –‘জালের বন্ধনে বড় গুনিল তরাস’।ফুল্লরাকে কালকেতু বলেছেন –

‘গোধিকারে বাঁন্ধিআছি রাখি জালদড়া

ছাল খসাইআ প্রিয়ে কর্য্য সিকপোড়া’।(৫৪)

কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে বীর কালকেতুর মাথায় জালের দড়ি শোভিত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

‘পরিধান বীর- ধড়ি মাথাএ জালের দড়ি

অঙ্গে লেপিত রাঙ্গা মাটি’।(৫৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে বাগদী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। জেলে বা বাগদিরা মৎসজীবী। তারা মাটির বাড়িতে বসে জাল বোনে এবং মাছ ধরে। কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন -

'বাগদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র লৈয়া করে

দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে

মাটীয়া নিবস পরে জাল বুনে মাছ ধরে

কোঁচগণ বৈসে নানা রঙ্গে'।[৫৬]

দৈনন্দিন নানা গৃহস্থালী প্রয়োজনেও দড়ির প্রয়োজন হয়। ধোবা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। ধোবা কাপড় পরিষ্কার করেন, কাপড় দড়িতে শুকায়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'নগরে করিআ শোভা নিবসে অনেক ধোবা

দড়ায় শুখায় নানা বাসে'। [৫৭]

দড়ি দৈনন্দিন গৃহস্থালী দ্রব্য। এই তুচ্ছ বস্তুটিও গৃহের নানা প্রয়োজনে লাগে। মধ্যযুগের বাংলাদেশ ছিল জাতি বিভক্ত। বৃত্তি-সম্প্রদায় এবং জাতি একসূত্রে গ্রথিত। এরা ছিলেন শিল্পী। মধ্যযুগের বাংলাদেশে বিভিন্ন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছিল বৈষম্য।ছিল সামাজিক বৈষম্য, কর্মের বিভাজনগত বৈষম্য, ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। ধোবা সম্প্রদায় ছিলেন সমাজের একান্তই অবহেলিত সম্প্রদায়। পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত জাতি। কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে এই বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের কর্মপ্রবাহকে ফুটিয়ে তুলেছেন। R.V.Russell তাঁর 'The Tribes and Castes of the Central provinces of India, volume I,' গ্রন্থে লিখেছেন –"The Dhobi or washerman gets half the annual contribution of the blacksmith and carpenter, with the same presents, and in return for this he washes the clothes of the family two or three times a month. When he brings the clothes home he also receives a meal or a wheaten

cake, and well-to-do families give him their old clothes as a present". [৫৮]

কাব্যে উল্লিখিত অনার্য লোকশিল্প : ব্যাঘ্রচর্ম, মৃগছাল - প্রাচীনকালে অরণ্যে পশু এবং মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান ছিল। বর্বর যুগ পেরিয়ে মানুষ সবেমাত্র শীলিত সংস্কৃতির অধিকারী হচ্ছে। মানুষ যখন লজ্জা অনুভব করেছে, তখন সভ্যতার কিছু ধাপ সে অতিক্রম করেছে। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করেছে।মানুষের সৌন্দর্যচেতনা স্ফুরিত হয়েছে। মানুষ লজ্জা নিবারণ করেছে। লোকশিল্পের বিকাশ ঘটেছে এই পর্বে। নগ্ন আদিম মানুষ সংস্কৃত হয়েছে অঙ্গাভরণের দ্বারা। যখন সুতো কাটার যন্ত্র উদ্ভাবন হয়নি , তখন গাছের বাকল এবং পশুচর্মই মানুষের লজ্জা নিবারণের উপায় ছিল। আরণ্যক মানুষ পশুদের সঙ্গেই সহাবস্থান করতেন। দেববাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্মশানে-মশানে ফেরা শিব দেবতাকে ভারতীয় সংস্কৃতির শীলিত ধারার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পৌরাণিক পটভূমিকায় শিবের আধ্যাত্মিক তাপস ধ্যানমগ্ন গম্ভীর মূর্তি কল্পনা ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বিত হয়ে ওঠে। দেবতা শিব যেমন ব্যাঘ্রচর্মের আভরণ পরতেন, তেমনি প্রাচীন তপোবনবাসী ঋষি, ঋষিপত্নীরা পরতেন বল্কল- 'বৃক্ষত্বঙ্ নির্ম্মিত বসন; তাপসের পরিধেয় বস্ত্র'।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মৃগছাল, ব্যাঘ্রচর্ম বা বল্কবাসের উল্লেখ নানাস্থানে এসেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে নিম্নলিখিতভাবে চর্মবসনের উল্লেখ এসেছে।

[নিম্নোক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া]। [৫৯]

১) বাঘছাল (পৃ:১২) ২) বল্কবাস (পৃ:১৮) ৩) বাঘছাল (পৃ:১৯) ৪) বাঘছাল (পৃ:২১) ৫) বাঘছাল (পৃ:২৩) ৬) বাঘছাল (পৃ:২৫) ৭) বাঘছাল (পৃ:২৭) ৮) বাঘছাল (পৃ:৩৭) ৯) মৃগছাল (পৃ:৫৩)।

শিবকে অকুলীন এবং অনার্য দেবতা বলে মনে করা হয়। বাঘছাল শ্রেষ্ঠভূষণ রূপে বিবেচিত। পুরাণে এমন অনার্য দেবতাকে সংস্কৃত করা হয়েছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'শিবের পরিধান বাঘছাল গলাত্র হাড়ের মালা

বিভূতি ভূষণ জার অঙ্গে'। [৫৯](ক)

শ্মশানচারী আরণ্যক অনার্য দেবতা শিবের উত্তরণ মঙ্গলকাব্যগুলিতেও দেখা যায়। দরিদ্র শিব গৌরীর পরামর্শে চাষে উৎসাহ দেখিয়েছেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে জমি পাট্টা নিয়েছেন। বিশ্বকর্মাকে ত্রিশূল দিয়ে লাঙল, জোয়াল এবং মই গড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু শিবের আভরণ বাঘছাল। আর গৌরী তপস্যা করছেন শিবের জন্য। ব্রতপালন করছেন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে। কুশে শয়ন করছেন। আর পরেছেন বল্কবাস –

"বল্কবাস পিঙ্গল কেশ অরুণ মুরতি

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়তি"। [৬০]

বাঘছাল দারিদ্র্যের চিহ্ন বহন করে। পড়শীরা গৌরীকে ব্যঙ্গ করেন – 'দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল'।

কবিকঙ্কণের কাব্যে আরণ্যক অষ্ট্রিক ব্যাধ রমণী ফুল্লরা পরিচ্ছদ রূপে মৃগছাল ব্যবহার করেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'এই মৃগ জবে ধরি বেচিআ সম্বল করি

ফুল্লরা পরিব বাঘছাল'। [৬২]

ভারতবর্ষে প্রায় তিনকোটি অধিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। আজ থেকে শত শত বছর আগে এরা পরতেন গাছের বল্কল কিংবা বাঘছাল। ফুল্লরাও পরেছেন বাঘছাল। অনার্য দেবতা শিব পরেছেন বাঘছাল। একথা ঠিক, আর্য এবং অনার্য দুই জাতিই পরস্পর পরস্পরের নিকট ঋণী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নব্বই সূক্তে বলা হয়েছে, এক বিরাট হিরণ্য পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য, উরু হতে বৈশ্য এবং দুই চরণ হতে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। -

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"।। [৬৩]

আর্যরা আসার পূর্বে এদেশের আদিম অধিবাসীরা ছিলেন ভারতের উপজাতি আদিবাসী। অষ্ট্রিক দ্রাবিড় বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উল্লেখ করতে হয়। এরা সকলেই ভারতের আদিম অধিবাসী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক একজন ব্যাধ যুবক। মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণ, অত্যাচারে জর্জরিত এরা। বর্ণ হিন্দু সমাজে অচ্ছুত, অস্পৃশ্য। জাতিভেদ জর্জরিত বাংলাদেশে উপজাতিদের আশ্রয় অরণ্য। শিকার এদের জীবিকা। অনার্য দেবতা শিব, অনার্য ব্যাধ যুবক কালকেতু এবং ফুল্লরা পরেছেন বাঘছাল। পরবর্তীকালে উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং কায়স্থতন্ত্রের অনুশাসন আদিবাসী এবং শূদ্রদের সমাজে অচ্ছুত, হীন ও অস্পৃশ্য করে তুলেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে অনার্য পরিচ্ছদের একটি অতীত , দূরাগত অধ্যায় ফুটে উঠেছে।

অনার্য লোকশিল্প - হাড়মালা, মুণ্ডমালা: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণিত। দেবী চণ্ডীর উৎস কল্পনায় অনার্য-আর্য, অব্রাহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার। প্রাচীন ভাবনায় চণ্ডীদেবী আর্যেতর আরণ্যক ব্যাধ সমাজের দেবী রূপে পূজিত হতেন। ব্যাধ সমাজের বিশ্বাস সার্থক শিকারী হতে হলে , দেবী চণ্ডীর পূজা করে কৃপালাভ করতে হয়। দেবী চণ্ডী অরণ্যে বসবাসকারী পশুদের দেবীও বটে। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন, পুরাণ প্রভাবে দেবতা শিব এবং শিব গৃহিণী চণ্ডীকে সংস্কৃত করে দেখানো হয়েছে। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে শিবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে আরণ্যক মানুষ পশুর সঙ্গে সহাবস্থান করতেন। তখনও মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠেনি। সদ্য বর্বর যুগ পেরিয়ে মানুষ সংস্কৃত হওয়ার সাধনা করছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিব ও দুর্গার হাড়মালা এবং মুণ্ডমালা সেই উত্তরণের সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে হাড়মালা এবং মুণ্ডমালা উল্লিখিত হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে –

হাড়মালা – ১) হাড়ের মালা (পৃ:৯) ২) হাড়ের মালা (পৃ:১২) ৩) হাড়মালা (পৃ:১৯) ৪) হাড়মালা (পৃ:২১) ৫) হাড়মালা (পৃ:২৫) ৬) হাড়মালা (পৃ:২৭) ৭) হাড়মালা (পৃ:৩৭)

মুণ্ডমালা - ১) মুণ্ডমালা (পৃ:১০২) ২) মুণ্ডমালা (পৃ:১০২) ৩) মুণ্ডমালা (পৃ:২৭৪ বণিকখণ্ড) ৪) মুণ্ডমালা (পৃ:২৭৬, বণিকখণ্ড) ৫) মুক্তমালা (পৃ:২৭৬, বণিকখণ্ড)

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া]। [৬৪]

দেবী চণ্ডীর অলংকার হাড়মালা এবং মুণ্ডমালা। পৌনঃপুনিক সংগ্রাম, প্রতিদ্বন্দ্বী অশুভ শক্তির বিনাশ, অন্ধকারের বুকে আলোকের শিখা, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা, বিঘ্নজয়ী, কল্যণীমূর্তির প্রতিষ্ঠা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। দক্ষ শিবনিন্দা করেছেন –

'ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা

হেন জন আমার জামাতা'। [৬৫]

পার্বতীর কাছে ছদ্মবেশী দ্বিজ শিবনিন্দা করেছেন –

'বসন বাঘছাল গলাত্র হাড়মাল

উত্তরী জার বিষধরে'। [৬৬]

সখীরা ভিক্ষুক শিবকে নিন্দা করছেন – 'সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল'। [৬৭]

পার্বতীর তাড়নায় শিব ভিক্ষায় বেরুতে চান –

'আন বাঘছাল শিঙ্গা হাড়মাল

ডম্বুর বিভূতি ঝুলি'। [৬৮]

ঋগ্বেদে রুদ্রের উল্লেখ আছে ১ম মণ্ডলের ৪৩সূক্তে। এই রুদ্র দেবতা শিব কিনা তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে রুদ্রদেবতা শিব নামে চিহ্নিত। রুদ্রের আদি অর্থ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ। বাংলাদেশে শিব দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্তি। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের লোকসমাজে শিব প্রধান দেবতা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবতা শিব শীলিত দেবতা। ঋগ্বেদে রুদ্রকে 'প্রকৃষ্ট জ্ঞান যুক্ত অভীষ্ট বর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র' বলে বলা হয়েছে – "রুদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীড়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শংতমং হৃদে"। [৬৯]

দেবী চণ্ডীর ভয়ঙ্কর মূর্তির উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ – 'গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকট দশনা' । [৭০] কলিঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখছেন দেবীর ভীষণারূপের – 'কাতি খর্পর হাথে গলে মুণ্ডমালা।' [৭১]

সিংহলে যুদ্ধক্ষেত্রে মুণ্ডমালা পরিহিতা দেবীমূর্তিকে কবিকঙ্কণ কাব্যরূপ দিয়েছেন –

'মাছে জেন বাড়ে পাড়ে ছেচিআ দানা ঝাড়ে

দশ বিশ গাঁথে মুণ্ডমালা'। [৭২]

যুদ্ধক্ষেত্রে শব এবং প্রেতের বর্ণনা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ –

'জোড়া দামা বাজে কালি বাজনা বাজায় ঢুলি

চৌদিকে লম্বিত মুণ্ডমালা'। [৭৩]

ভারতীয় হিন্দু পুরাণে দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন রূপের কল্পনা করা হয়েছে। W.J.Wilkins তাঁর 'Hindu Mythology' গ্রন্থে লিখেছেন – "KALI [.....] another form of the goddess, named Chandi, [.....]. For earrings she has two dead bodie; wears a necklace of skulls, her only clothing is a girdle made of dead men's hands, and her tongue protrudes from her mouth." [৭৪]

নরমুণ্ডের মালা দেবী চণ্ডীর অলংকার। নরমুণ্ড এক অনার্য ভয়াল সময় প্রবাহকে স্মরণ করায়। সভ্যতার পরিশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নরমুণ্ডকে মালার রূপ দেওয়া হয়েছে। নরমুণ্ড দেবী চণ্ডীর ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য। পৌরাণিক পটভূমিকায় দেবীর ভীষণারূপের সঙ্গে একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই চণ্ডীই আমাদের গৃহের কল্যাণ লক্ষ্মী উমা। কবির কাব্যে চণ্ডীর ভয়াল মূর্তির সাহিত্যরূপ দ্যোতিত।

আর্য ও অনার্য সম্প্রদায়ের বিবাহে লোকাচার ও লোকশিল্প - সামাজিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বিবাহ। আদিম সমাজ পরবর্তী বিবাহ ব্যবস্থায় উত্তরণ ছিল দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। সমাজ বিকাশ এবং সমাজ শৃঙ্খলা – আদর্শ জীবনবোধের ধারণা সুপ্রাচীন কাল থেকে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করেছে। দেশে

দেশে কালে কালে বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা আচার, রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস – সংস্কার। হিন্দু সমাজেও বিবাহের নানা রীতি-নীতি , আচার- আচরণকে নানাভাবে মান্যতা দেওয়া হয়। লোকশিল্প বিবাহের উপকরণ রূপে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অনার্য বিবাহে লোকাচারের পরিচয় দিয়েছেন কবি। কালকেতুর শুভবিবাহের আয়োজন উপলক্ষ্যে লোকাচার ও লোকশিল্পের উল্লেখ করেছেন কবি। কালকেতুর পিতা ধর্মকেতু বিবাহের জন্য সোমাঞি পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়েছেন। ব্যাধ সমাজে পণ দেওয়া নেওয়ার রীতি, ঘটকালির ঘটকের প্রাপ্য উপঢৌকন, তিথি নক্ষত্রের বিচার, অধিবাস ডালা সংগ্রহ, শুভক্ষণে ছাঁদনা বাঁধা এবং গোময়ে মাটি লেপে আলপনা দেওয়া, সর্বোপরি মণ্ডপ বাঁধা বিবাহ উদ্যোগের এক বিশেষ দিক। বিবাহে শঙ্খ, চামর, দর্পণ প্রভৃতি লোকশিল্পের সমাহার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দূর্বা, ধান, পুষ্পমালা, দধি, ঘি, সিঁদুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য বিবাহ অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কালকেতুর বিবাহ অনুষ্ঠান অনার্য লোকসমাজে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাউরি দোলা নিয়ে বিবাহ মণ্ডপে হাজির হয়েছেন। এমন মঙ্গল উৎসবে নানা লোকবাদ্যের (ঢেমচা, কাড়া) সমাহার। উলুধ্বনি, মঙ্গলপ্রদীপ, ছায়ামণ্ডপ, বনফুলমালা, পাটের আসন, কুশ হস্তে কন্যাদান, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ধনুক এবং বাণ জামাতাকে অর্পণ প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক লোকাচার এক রমণীয় পরিবেশে সম্পন্ন হয়। মঙ্গলকবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন –

“গমনের শুভ বেলা বাউরি যোগায় দোলা

তথি বীর কৈল আরোহণ

চৌদিকে দেউটি জলে বসিল কুঞ্জর – ছালে

বন্ধুজন মেলি কুতুহলে

বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জমকেতু

করে কুশে করে কন্যাদান।

ঢেমচা বাজয়ে পড়া দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া

বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী”। [৭৫]

দেখা যাচ্ছে, নানা লোকশিল্পের সমাহার বিবাহ উৎসবে। অনার্য সংস্কৃতির মঙ্গল অনুষ্ঠানে নানা রীতি নীতি, আচার পালিত হয়। লোকশিল্প সেই পালনীয় মঙ্গল আচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমাজে আর্থিকভাবে পুষ্ট অভিজাত-বণিক সম্প্রদায় এবং সুবিধাভোগী বিত্তবানেরা শীলিত জীবন পরিচর্যার অংশীদার ছিলেন। মধ্যযুগে হিন্দু – কুলীনদের বিবাহ অনুষ্ঠানে নানা লোকশিল্পের ব্যবহার হত। S.C.Bose তাঁর 'The Hindoos as they are' গ্রন্থে লিখেছেন – "[.....]The articles consist of silver Ghara, Gharoo, Batha, thalla, Batti, Glass, Raykab, Dabur, Dipay and Pickdan, are arranged in proper order, and flowers, sandal – paste, dooav grass, holy water in copper pans, and khoosh grass, are placed before the priests of both parties. The bridegroom, laying aside his embroidered robe, is dressed in a red silk cloth, and taken to the place of worship, where the bride, also attired in a silk saree, veiled and trembling through fear , is slowly brought from the female penetralia on a wooden seat brone by two servents and placed on the left side of the bridegroom'. [৭৬]

খুল্লনার বিবাহ উত্তম ফাল্গুন মাসে। অভিজাত বণিক ধনপতি দত্ত। বিবাহের জন্য লগ্ন বিচার করে শুভক্ষণ নির্ণয় করা হল। ঘটক জনার্দন পণ্ডিত। অধিবাসের আয়োজন সম্পূর্ণ। গায়েন মঙ্গল গীত গাইছেন। বিবাহ আচার পালিত হচ্ছে। সেকালে হিন্দু কুলীন বা অভিজাতদের গৃহে থাকত ঠাকুরদালান। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটি ভর্যা গন্ধ চুয়া

বিদ দাড়িম্ব পাঁচ কাঠা

পাট ভর্যা নিল খই ঘোড়া ভরা ঘৃত দই

সাজিআ সুরঙ্গ নিল বাটা

.....

সর্ষব পুটলি ভরা বান্ধ্যা নিল কোল সরা

সুতা নিল নাটাই সহিত।

সুরঙ্গ পাটের সাড়ি লইল রঙ্গন – কড়ি

বিদমালা সুবর্ণে জড়িত

গোরচনা দিল শঙ্খ চামর চন্দনপঙ্ক

ফুলমালা কজ্জল দর্পণ'। (৭৭)

এছাড়া বিবাহের আচারে নানা লোকশিল্প ও লোকবাদ্যের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ –

'উপরে ফুলের ঝারা স্থাপিল গনেশ –বারা

দ্বিজগণ করে বেদ গান

পটহ মৃদঙ্গ সানি দগড় কাসর বেনি

শঙ্খ কাজে দোখণ্ডি বল্লকী

টমক খমক ভেরি জগঝম্প সারি সারি

অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নৃত্তকী'। (৭৮)

হিন্দু বিবাহে নানা স্ত্রী আচার পালন করা হয়। শাশুড়িমাতা জামাতাকে 'লোহিত কম্বলে' বসতে দেন। কেউ জল দিয়ে পা ধুয়ে দেন। বিবাহের পর সুতো দিয়ে কনের কাপড় জামাতার কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে দেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ চন্দন

দিআ লক্ষপতি করে বরের বরণ।

তবে রম্ভা স্ত্রী আচার করে যথাবিধি

বরের চরণে পাদ্য ঢালা দিল দধি।

....

রম্ভা সুতা দিআ খোঁজে বরের অধর

সেই সুতা বাঁধ্যা রাখে খুল্লনার বসনে

....

আনিল আইবড়ার সুতা লাটাই সহিত

সাতফের ফেরা দিআ করিল বেষ্টিত

সেই সুতা বান্ধ্যা থুইল খুল্লনার অঞ্চলে'। (৭৯)

বিবাহে কালে কালে যৌতুক উপকরণের পরিবর্তন হয়। সুতা-নাটাই, তীর-ধনুকও যৌতুক সামগ্রীর বিষয় হয়ে ওঠে। সোনা রূপার অলংকার হিন্দু বিবাহে সর্বকালীন-সার্বজনীন স্বীকৃত যৌতুক। S.C.Bose তাঁর 'The Hindoos as they are' গ্রন্থে লিখেছেন –

'That a University degree has raised the marriageable value of a by, there can be no doubt. If he have Successfully passed some of these examinations and got a scholarship, his parents, naturally priding themselves on their valuable acquisition, demand a preposterous long catalogue of gold ornaments, which, it is not often in the power of family in middling circumstances easily to bestow'. (৮০)

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিবাহে যৌতুক ও বিভিন্ন আচার-সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীমন্তের বিবাহের যৌতুক প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

' অভয়ার প্রতিফলে করে কুশে গঙ্গাজলে

রাজা করে কন্যাসম্প্রদান।

শয্যা ঝারি ধেনু থালা রথ গজ ঘোড়া দোলা

দিআ জামাতার কৈল মান।

বাজে মঙ্গল-পড়া দ্বিজ বান্ধে গ্রন্ত চূড়া

বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী'। [৮১]

লোকশিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ও স্থানিকতা। বিবাহের যৌতুক রূপে এমন লোকশিল্পও সিংহলরাজ জামাতা শ্রীমন্তকে দান করেছেন –

"নানাধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার

দিলেন দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ভারে ভার

চামর চন্দন দিল হিরা মুতি পলা

জামাতারে দিল কনকের কণ্ঠমালা"। [৮২]

সিংহলরাজ কন্যাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দিয়েছেন দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, চামর, হীরা-মুক্তোর অলংকার এবং সোনার হার। লক্ষণীয়, সমুদ্রবেষ্টিত সিংহলদেশে পাওয়া যায় দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। কবিকঙ্কণ সেই দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

সাধভক্ষণ: লোকশিল্প, অনার্য ও আর্য আচার- সন্তান সম্ভবা রমণীরা বাংলাদেশে সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ সম্মান-সহানুভূতি, মর্যাদা এবং যত্ন পেয়ে এসেছেন। লোকসমাজে গর্ভধারণকালে রমণীরা কিছু স্ত্রী আচার পালন করে এসেছেন। লোকসমাজ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সন্তান সম্ভবা রমণীদের এমন পালনীয় রীতিনীতিকে মান্যতা দিয়ে এসেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর্য এবং অনার্য এই দুই পৃথক গোত্রভুক্ত মানুষের জীবনচর্যার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের আখেটিক খণ্ডে যেমন অনার্য আচার প্রতিফলিত, ঠিক তেমনি বণিকখণ্ডে আর্য আচারের প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে। আখেটিক খণ্ডে নিদয়ার সাধভক্ষণ এবং বণিকখণ্ডে খুল্লনার সাধভক্ষণ প্রসঙ্গে মধ্যযুগের স্ত্রী আচারের পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। এছাড়া খুল্লনার মাতা রম্ভার সাধভক্ষণ প্রসঙ্গে সেকালের কিছু রীতিনীতির উল্লেখ করেছেন কবি মুকুন্দরাম।

অনার্য ব্যাধ সমাজে গর্ভধারণকালে কিছু স্ত্রী আচার পালন করা হয়। গর্ভসঞ্চারের চারমাস সময়কালে গর্ভবতী রমণী 'মৃত্তিকা ভক্ষণ' করেন। সাতমাস এবং নয় মাস সময়ে সাধভক্ষণ করানো হয়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই

পোড়া মীনে জামিরের রস'। [৮৩]

এছাড়া মহিষের দই মাখানো খই, মিঠা ঘোল, পাকা চালতার ঝোল, আঁমসি, ইঙ্গিচা (হেলেঞ্চা), পলতা, কলমী, গিমা শাকের রন্ধন, ফুল বড়ি, পুই কচু দিয়ে মরিচের ঝাল, পাকা তাল, নেউল এবং গোধিকা পোড়া, হাঁসডিম, চিঙড়ির বোড়া, সজারুর শিকপোড়া আর মুলো, সিম, ডিম, ডমুরের তরকারী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়েছে। নিদয়ার সাধভক্ষণের জন্য এসব রান্না বান্না হয়েছে। ব্যাধ ধর্মকেতু নিজে রন্ধন করে নিদয়াকে দিয়েছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

'নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে জায় ধর্মকেতু

চাহিয়া আনিল আয়োজন

আপনি রাঁধিয়া ব্যাধ নিদয়ারে দিল সাধ'। [৮৪]

প্রসব করানোর জন্য লোকসমাজে মন্ত্রপূত ঔষধের সন্ধান করা হয়। কোন অভিজ্ঞ রমণী এমন ঔষধ সন্ধান করেন। মন্ত্রগুণীরা মন্ত্রপূত ঔষধ সন্তান সম্ভবা রমণীকে প্রদান করেন – 'কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে'।[৮৫]

এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে প্রসববিদ্যা আয়ত্তকারী ধাত্রীরা প্রসবিনী মাতাকে সাহায্য করেন। এভাবে ভূমিষ্ঠ হলেন কুমার কালকেতু। ঋগ্বেদে গর্ভসঞ্চার, গর্ভরক্ষা এবং প্রসব হওয়ার মন্ত্র উল্লিখিত আছে। গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সুবর্ণ নির্মিত অরণির ঘর্ষণ, দশম মাসে প্রসব হওয়ার মন্ত্র, গর্ভস্থ সন্তানকে আহ্বান, বিষ্ণু দেবতার প্রতি স্তুতির উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তে –

"হিরণ্যয়ী অরনী যং নির্মংযতো অশ্বিনা।

তৎ তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে"।।[৮৬]

সাধভক্ষণের ক্ষেত্রে আর্য রীতি-নীতি অনার্য আচারের থেকে একেবারে পৃথক নয়। আর্য আচার কিছুটা শীলিত। খাদ্যতালিকায় উভয় রীতি নীতির পার্থক্য বিদ্যমান। আর্য – অনার্যের সমন্বয় আচারের মূল বিষয়গুলিকে একসূত্রে বেঁধেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে খুল্লনার মাতা রম্ভা সন্তানসম্ভবা। খুল্লনা মাতৃগর্ভে বড় হচ্ছেন। রম্ভার সাধভক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মধ্যযুগের হিন্দু সংস্কারের প্রভাব, পালনীয় এবং আচরণীয় কিছু প্রথার উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম। কবিকঙ্কণ লিখেছেন –

"সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ

নয় মাসে প্রসববেদনা অবসাদ।

....

ফেড়িআ চালের খড় জালিল আতুড়ি

গোমুণ্ড স্থাপিআ দ্বারে পূজে যষ্টিবুড়ি"।[৮৭]

এক প্রজন্ম পরে খুল্লনা সন্তান সম্ভবা হয়েছেন। গর্ভবতী রমণীদের টক খাওয়ার ইচ্ছে সুবিদিত। আখেটিক খণ্ডে অনার্য ব্যাধ রমণী নিদয়া গর্ভসঞ্চারের কালে আমসি খেতে চেয়েছেন। আর অভিজাত বণিক পত্নী খুল্লনা লতা পাতা বনশাকের ব্যঞ্জন খেতে চেয়েছেন। এছাড়া খেতে চেয়েছেন মহিষের দই মাখানো খই। এছাড়া খুল্লনা খেতে চেয়েছেন মসুর ডালে আমের সুপ ও আমসি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম গর্ভসঞ্চার কালে খুল্লনার ইচ্ছেকে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে –

"জদি কিছু পাই সুখ আম্রে মসুরের সুপ

প্রাণ পাই পাইলে আমসী

দেখি জেমন সোনা শকুল মৎস্যের পোনা

গোটা কাসন্দি দিবে তথি"। [৮৮]

এছাড়াও খুল্লনা 'সাধভক্ষণ' অনুষ্ঠানে ঘোলে মেসানো লাউ, দুধ, তিল এবং গুড় মেশানো জাউ খেয়েছেন। আর খেয়েছেন নানা শাকের ব্যঞ্জন। নটে, পাট, পালঙ, নালিতা, পলতা, বনপুই, হিনচা, কলমী, নাউডগা প্রভৃতি শাকের ব্যঞ্জন লহনা খুল্লনার সাধভক্ষণের জন্য রন্ধন করেছেন। এছাড়া লহনা খুল্লনার জন্য বিশেষ ভাবে রান্না করেছেন চিতলের ঝোল, রুই মাছ, কুমড়া বড়ি, আলুর ঝোল, আম শোল, পুঁটি মাছ ভাজা। সব মিলে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। মুকুন্দরাম লিখেছেন – 'সাধখান খুল্লনা নারী জন'। (৮৯)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সন্তান সম্ভবা মায়ের বেদনার সঞ্চার হয়। লোকবিশ্বাস, আসন্ন প্রসবা রমণীর কষ্ট লাঘবের জন্য ঔষধির প্রয়োজন হয়। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে লিখেছেন –

"কপটে চণ্ডিকা তার বাটীল ঔষদ

চণ্ডীর ঔষদে তার খণ্ডিল বিপদ"। (৯০)

শিশু শ্রীপতি জন্মেছেন। হিন্দুর লোকায়ত সংস্কার, ষষ্ঠী ঠাকুরের পুজো, আঁতুর ঘর, নাড়ীছেদন – এসব লৌকিক আচার এবং ক্রিয়া কর্মে লোকশিল্প জড়োয়া সুতার মত বাঙালি গৃহকোণকে মঙ্গল আলোকে পূর্ণ করেছে। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য তাঁর "স্মৃতিচিন্তামণিঃ" গ্রন্থে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের পর 'জাতকর্ম্ম' সংস্কারের কথা বলেছেন। জন্মদিন থেকে দশদিনের দিন, অশৌচান্তদিনে, দ্বাদশ দিনে কিংবা একশত দিনের দিন, নামকরণ করার কথা বলেছেন। পিতা দশদিনের দিন বালকের নামকরণ করেন। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন –"অথ জতকর্ম্ম।পুত্র জন্মানন্তরং জাতকর্ম্ম কর্ত্তব্যম।'প্রসবে জাতকর্ম্ম চ' ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ। অথ নামকরণম্। জন্মদিনাৎ দশমদিনে অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনে দ্বাদশে শততমে বা দিনে নামকরণং কুর্য্যাৎ। পূর্ব্বপূর্ব্বকল্প শক্তৌ পরপরকল্পঃ।তথা চ পারস্কর:-

"দশম্যামুত্থাপ্য পিতা নাম কুর্যাৎ"। (৯১)

লোকশিল্প-মন্ত্র ও সংস্কার: চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মন্ত্র ও জাদুর উল্লেখ আছে। প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি সংস্কৃতির গভীরে মন্ত্র স্থান নিয়েছে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখন্ডে মন্ত্রের প্রভাব বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। আখেটিক খন্ডে কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে মন্ত্রের

প্রভাবে। পৌরাণিক পটভূমিতে ইন্দ্রের নির্দেশে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামানোর কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি মেঘবন্দনা। এটি স্পর্শমূলক জাদু। লোক-বিশ্বাস সংস্কার এর সঙ্গে যুক্ত। পণ্ডিত কবি মুকুন্দরাম কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁর জ্ঞানতীক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে মেঘের শ্রেণী চরিত্র বিচার করেছেন। আর মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে কালিদাসের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। মেঘের চারটি জাতির উল্লেখ রয়েছে এখানে-দ্রোণ, পুষ্কর, আবর্ত এবং সম্বর্ত। যখন বৃষ্টিহীন বোশেখ মাস কাঠফাটা রোদে ধূ ধূ করে, তখন লোকসমাজে লোকায়ত মানুষ মেঘকে পূজা করে বৃষ্টি নামানোর প্রার্থনা করে। জাদুবিশ্বাসের প্রভাব এখানে সক্রিয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন-

"চল রে পুষ্কর মেঘ দুষ্কর তোমার বেগ

সঙ্গে চল কুমুদ বামন

তুমি যদি মন কর প্রলয় করিতে পার

কলিঙ্গের কোথায় গণন"। [৯২]

মেঘের কাছে এ এক বিনীত প্রার্থনা।

কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ অংশে লিখেছেন-

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং

জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ"।

বণিকখন্ডে সওদাগর ধনপতি দত্তের দুই পত্নী-লহনা ও খুল্লনা। ধনপতির তরুণী ভার্যা খুল্লনা। বিগত যৌবনা লহনা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েন। লীলাবতী তাকে আশ্বস্ত করেন। মন্ত্র ও ঔষধির সাহায্যে হারিয়ে যাওয়া যৌবন ফিরে পাবেন তিনি। ধনপতির প্রিয় পাত্র হবেন। লোকশিল্পের সাহায্যে মন্ত্রের প্রয়োগ ঘটেছে। লোকায়ত মানুষ লোকসমাজ উদ্ভুত সংস্কার-আচার ও প্রথাকে মান্যতা দিয়েছে। ঔষধ প্রস্তুতিতে মন্ত্রের সাহায্য নিয়েছে লীলাবতী। এমন ঔষধ ও মন্ত্রের জন্য কী করছেন তিনি?-

"পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে

ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে প্রতিদিনে।

.....

চুনে পান খদিরে করিআ তার খার

গুণ্যা বলদের গাজা ঔষধের সার"। [৯৪]

মন্ত্রে চুন এবং পানের ব্যবহারও হয়। মন্ত্রের সুফল পেতে গেলে বাড়ির আঙিনায় কলাগাছের আলপনা আঁকতে হবে। হরিদ্রার মূল, শ্মশানের তিল ফুল বেটে খুল্লনার কাপড়ে লেপে দিতে হবে। প্রতি শনিবার 'নিশাবাতি' প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। কালো বিড়ালকে দরজার সামনে বলি দেওয়া হয়। শুশুকের তেল, শকুন-শকুনির হাড়, সাপের ছাল, নেউলের অন্ড, ছিনা জোঁক, শ্বেত কাকের রক্ত, কালো কুকুরের পিত্ত, কচ্ছপের নখ, কুমিরের দাঁত, পেঁচা, গোধিকা, বাদুড় এবং সজারুর অঙ্গ তেমাথায় পুতে ফোঁটা নিতে হবে। এছাড়া শঙ্খ, মাছি, সাপ এবং চাতকের অঙ্গ কেটে স্বামীর খাটে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে পাঁচ ফুল দিয়ে মন্ত্র পেড়ে স্বামীকে পাঁচ বাণ মারতে হবে। আর স্বামীর জন্য রাখা বাঘ তেল নিজের মুখে মাখতে হবে। এভাবেই খুল্লনার রূপ নাশ করে, তার সর্বনাশ সাধন করে নিজের স্বামী আসঙ্গ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করেছে লহনা। তিনি সতীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। দুর্বলা দাসীর সাহায্য নিয়েছেন। সাপুড়ের কাছ থেকে মন্ত্রপূত ঔষধ সংগ্রহ করেছেন। কবি লিখেছেন-

"মানিক ভান্ডারে আনে ঔষধের পেড়ি।

অবধানে আল্বাইল দ্রববন্ধন দড়া।

লহনার হাথে দেয় ঔষধ-সাঁপুড়া"। [৯৫]

এখানে যে সব লোকশিল্প ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হল প্রদীপ, নিশাবাতি এবং দেওয়ালের আলপনা। বিগত যৌবনা নারীকে মানসিক শক্তি যুগিয়েছে এমন সামাজিক সংস্কার। সময়ের প্রতিবিম্বরূপে মন্ত্রে লোকশিল্পের ব্যবহার এসেছে।

লোকশিল্পের সঙ্গে মন্ত্র অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। 'Folk art and Magic' গ্রন্থে Alan Carter Covell লিখেছেন-"This special group of folk paintings

invariably contains portraits of the major spirits with whom the shaman gets in touch during a scance or even as a daily salutation within her or his personal ritual room or tang". [৯৬]

মিশরীয় লোকশিল্পের সঙ্গে বাংলার লোকশিল্পের কিছু মিল লক্ষ করা যায়। মিশরীয় শিল্পে যাদুবিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। J.R. Harris তাঁর 'Egyptian Art' গ্রন্থে লিখেছেন-"[...] of wood, metal and other material, where greater freedom was possible, can only be due to innate conservatism of the Egyptian carftsman or the need to fulfil some Quasi-magical requirement". [৯৭]

সেকালের হাট, বৈদেশিক বাণিজ্য, সমাজ, অর্থনীতি ও লোকশিল্প বিনিময়:

অর্থনীতি ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের নিয়ন্তা। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচক। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে দেখা যাচ্ছে, কাব্যের নায়ক কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপায় অর্থলাভ করেছেন। অনার্য যুবক কালকেতু অর্থলাভ করে সংস্কৃত হতে চেয়েছেন। তাঁর ব্যাধ বৃত্তিতেও পরিবর্তন এসেছে। জীবিকা ক্ষেত্রেও ঘটে যাচ্ছে পর্বান্তর। দূরাগত কালের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে কবিকঙ্কণের কাব্যে। ষোড়শ শতকের অর্থনীতি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং কায়স্থতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ছিল। বৈশ্য সমাজও এক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না। সেকালের অনার্য ব্যাধ যুবক কালকেতুর পরাক্রম ও অর্থপ্রাপ্তি অনেকটা দৈব প্রসাদ লব্ধ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং কায়স্থতন্ত্রের কঠিন কারাশাসনে কালকেতুর অর্থপ্রাপ্তি সমাজতত্ত্ব এবং শ্রমনির্ভর অর্থনীতির নিরিখে অবান্তর, অবাস্তব এবং কষ্টকল্পিত মনে হয়। অলৌকিক দৈব অনুশাসন ছাড়া কালকেতুর অর্থলাভ এবং সংস্কৃত হওয়া সম্ভব হত না। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পের ব্রাহ্মণ জমিদার তর্করত্ন কিংবা তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসের সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক বিমল মুখুজ্জ্যে প্রভৃতিদের কঠিন যাঁতাকলে গোফুর কিংবা কমল মাঝিদের যা অবস্থা হয়েছিল, দৈব অনুশাসন বা কৃপা ছাড়া কালকেতুর অবস্থা তার থেকে ভিন্ন কিছু হত না। শুধু কালকেতু কেন, মুচি, চামার, কলু, ডোম প্রভৃতি শিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কঠিন নাগপাশে আজো অসহায় ভাবে টিকে আছে। উদ্‌বৃত্ত অর্থ থেকে গেছে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী

চরিত্রের হাতে। যাই হোক, দেবীর কৃপায় অর্থলাভ করে কালকেতু পত্নী এবং নিজের জন্য লোকশিল্প দ্রব্য কিনেছেন। কি কিনেছেন কালকেতু? কিনেছেন-

"কনকের সাঁজাকুড়া বিচিত্র পাটের গড়া

মাজকুড়া হিরায় জড়িত

চন্দন তরুর পীড়া লম্বিত মুকুতা চূড়া

কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।

নম্রমান মুতিআর অঙ্গদ কঙ্কণ হার

কিনে বীর কনক সাঁপুড়া

যুদ্ধের জিনিআ মর্ম অভেদ্য কিনিল বর্ম

নানা রত্ন-ভূষিত মুকুট

কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র তরোয়াল

মুঠি যার বিচিত্র পুরট।

তবক বেলক ঢাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি

ভূসন্ডি ডাবুষ খরসান

হিরামুঠি জমধর পট্টিশ খেটক শর

কিনে বীর কামান কৃপাণ"। [৯৮]

কালকেতু কিনেছেন-'কনকের সাঁজকুড়া' (সংযুক্ত কুণ্ডের মত আসন), 'পাটের গড়া', হীরা জড়িত 'মাজা কুড়া' (মধ্য শিখর বিশিষ্ট আসন), চন্দন কাঠের পীড়া, মুকুট চূড়া, কঙ্কণ, হার, বর্ম, রত্ন বিভূষিত মুকুট, মহিষের ঢাল, তরোয়াল, ঢাঙ্গি এবং যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র।

আর কালকেতু তাঁর পত্নীর সাধ আহ্লাদ পূরণ করতে কিনেছেন নানান অলংকার। এগুলি তাঁর পত্নী প্রেমের স্মারক-

"পুরিতে জায়ার সাদ কিনিল পাটের জাদ

মণি মুকুতা তাহে বেড়ি

হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা

কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচূড়ি।

.....

শকট বিমান রথ কিনে বীর শত শত

খাট পালঙ্গ কিনে দাসী"। (৯৯)

কালকেতু ফুল্লরার জন্য কিনেছেন মনিমুক্তো জড়ানো পাটের জাদ, হিরা-নিলা-মোতি-পলার কণ্ঠমালা সোনার চুড়ি আর কিনেছেন খাট পালঙ্ক এবং দাসী। সেকালে মেয়েদের কেনাবেচার জন্য হাট বসত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লোকশিল্প বিনিময় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বণিক খন্ডে বণিক ধনপতি দত্তের বাণিজ্যে লোকশিল্প বিনিময়ের উল্লেখ করেছেন কবি। সেকালে কড়ির ব্যবহার থাকলেও কাব্যে দেখানো হয়েছে বহির্বাণিজ্যে দ্রব্যের বদলে দ্রব্য এবং শিল্পের বিনিময়ে শিল্প আনয়নের রীতি মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন-

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ

বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুণ্ট বদলে টঙ্ক।

আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে পায়রা বদলে সুয়া

গাছ-ফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া।

সিন্ধুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা

পাট সোন বদলে ধবল চামর কাচের বদলে নীলা।

লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে সোলফার বদলে জিরা

প্লবঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা।

চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া

শুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

মাষ মুসরি তণ্ডুল মধুরি বরবটী বাটুলা চিনা

বদলে শটকে তৈল ঘি ঘটে সদাগর আন্যাছে কিনা। (১০০)

এক প্রজন্ম পরে ধনপতির পুত্র শ্রীপতি সিংহল দেশে গেছেন। শ্রীপতির শিল্প বিনিময় প্রায় একরকম। শুধু একটি ক্ষেত্রে বদল হয়েছে মাত্র-

'কুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে শুয়া'। (১০১)

মাত্র এক প্রজন্মের ব্যবধানে বাণিজ্য বিনিময়ে তেমন কোন বদল হয় নি। লক্ষ করা যাচ্ছে, অন্যান্য প্রাকৃতজ দ্রব্যের সঙ্গে যে সব লোকশিল্পগুলি বিনিময় হয়েছে, সেগুলি হল-শঙ্খ, চামর প্রভৃতি। গোরুর গাড়িতে (বদল শকট) করে সদাগর বাণিজ্য শেষে এগুলি দেশে নিয়ে ফিরছেন। একালের বাণিজ্য লিখিত চুক্তিপত্র, মুদ্রা বিনিময়। স্বাভাবিকভাবে হারিয়ে গেছে সেকালের সেই শিল্প বিনিময়। লোকশিল্পের একটা যুগ স্মৃতির আলেখ্য নিয়ে থেকে গেছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাতায়।

ঋগ্বেদ সংহিতায় সমুদ্রযাত্রার বিবরণ আছে। সমুদ্রকে অতিক্রম করার জন্য নৌকার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের চতুর্থ মন্ডলের ১১৬ সূক্তে বলা হয়েছে, কোন ম্রিয়মান মনুষ্য যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র অতিকষ্টে তাঁর পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠালেন। অশ্বিদ্বয় (দেবতা) নিজেদের নৌকা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল। সে নৌকা জলে ভেসে যায়, তাতে জল প্রবেশ করে না-

"তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িংন আবাহা কশ্চিন্মমৃবাং

তমূহথুর্ণীভিরাত্মস্বতীভিরংতরিক্ষপ্রুড্ভিরপোদকাভিঃ”

লোকশিল্প ও ধাঁধা-সাহিত্যিক দ্যোতনা: লোকশিল্প যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আধার হতে পারে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে কবি তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। লোকশিল্পকে ধাঁধাঁর মাধ্যমে প্রকাশ করে, সেই সুদূর মধ্যযুগে কবি সাহিত্যিক উৎকর্ষের চরমতা দাবী করতে পারেন। লোকশিল্পকে কেন্দ্রভূমিতে রেখে প্রশ্ন-উত্তর এবং রূপকের মাধ্যমে কবি ধাঁধা সৃষ্টি করেছেন। লোকশিল্পকে ব্যঞ্জিত করেছেন নানাভাবে। ফলত, সাহিত্য-সরস্বতী শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। পণ্ডিত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাঁর লেখনী এমন ক্ষুরধার, শক্তিশালী যে, কাহিনী-ঘটনা-বাস্তবতাকে নানা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তিনি শিল্পরূপ দিতে পারেন। তাঁর কাব্যে শুধু সামাজিক জিজ্ঞাসা এবং জীবনবোধের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নয়, তাঁর কাব্য চিন্তন ক্ষেত্র-বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনায় টইটম্বুর। জ্ঞানের উর্বর অনুসন্ধান মেলে কবির কাব্যে। তাঁর কাব্যে সাহিত্যিক ধাঁধার ব্যবহার অনেকবারই হয়েছে। কখনো তিনি ধাঁধাকে বলেছেন ‘প্রহেলিকা’, কখনো বলেছেন ‘হেঁয়ালি’। বণিকখন্ডে কবি সাহিত্যিক ধাঁধা ব্যবহার করেছেন। রূপকথার কথাবলা পাখি শুক সারি। ব্যাধ পাখিটিকে পীড়ন করেছে। রাজা তাকে রাজসভায় এনেছেন। রাজাকে তিনি ধাঁধা বলেছেন। রাজা ধাঁধার উত্তর দিয়েছেন। শুকপাখী রাজাকে তেরোটি ধাঁধা বলেছেন। ধাঁধাগুলির মধ্যে কয়েকটি লোকশিল্প সম্পর্কিত, লোকশিল্প সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ধাঁধাগুলি হল-উনুন, হুঁকো, শাঁখ প্রভৃতি।

উনুন বাংলাদেশের প্রতিটি গেরস্থ রমণীর নিজস্ব চারণক্ষেত্র। প্রাচীনকাল থেকে আগুন জ্বালানো, রন্ধন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে উনুন তৈরি হয়। মাটি খুঁড়ে, পরিপাটি করে, লেপা পোছা করে উনুন তৈরি করেন পল্লী রমণীরা। এককথায়, উনুনকে শিল্পিত রূপ দেন রমণীরা। রান্নাঘর রমণীদের কাছে দেবস্থান। উনুনে আগুন জ্বালানোর সময় অগ্নিদেবকে প্রণাম করে রান্না করা হয়। উনুনে অগ্নি প্রজ্বলনের সময়ে কিছু সংস্কার প্রথা এবং আচরণ পালন করা হয়। রমণীরা শুচিতা বজায় রেখে উনুনে রন্ধন কার্য সম্পন্ন করেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উনুনের উল্লেখ এসেছে ধাঁধার মাধ্যমে। বাংলার লোকসাহিত্যে ধাঁধা-প্রবাদ-ছড়া প্রভৃতি বিভাগে লোকশিল্প এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

এই প্রহেলিকা বা হেয়ালীর উত্তর উনুন। লোকশিল্পকে সাহিত্যে প্রয়োগের অভিনব চমৎকারিত্ব এনেছেন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। 'দুই মুখ এক কায়', 'এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়'-উনুন আগুন, জ্বালানি দেওয়া, আগুন উগরে দেওয়া-আশ্চর্য কবিতা, সাহিত্যিক ব্যঞ্জনার সীমানা স্পর্শ করেছে কবিভাষা। সাধারণ শব্দের জড়োয়া বুননে কবি সুকুমারী শিল্প রচনা করেছেন। উনুন তুচ্ছ আগুনের উৎস বা রন্ধন উপকরণ নয় শুধু, কবির চিন্তনের মানসক্ষেত্র, কল্পনার উৎসার, রূপকের মায়াজাল। সর্বোপরি বাস্তবের চেনা তুচ্ছতা অতিক্রম করে কবিত্বের অনাবিল আস্বাদ লাভ করেছে মুকুন্দের রচনায়।

বাঙালির গৃহকোণের এক গুরুত্বপূর্ণ লোকশিল্প উনুন। উনুনে আগুন জ্বলে। রন্ধন কার্য সম্পন্ন হয়। উনুনের শুচিতা বজায় রাখা হয়। মাটির তৈরি এমন উনুনে মুখ থাকে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধাঁধার মধ্য দিয়ে উনুনের সাহিত্যিক দ্যোতনা এনেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়

এক মুখে উগারাত্র আর মুখে খায়।

মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে

বুঝ বুঝ পণ্ডিত সভা মাঝে বৈস্যে"। (১০৩)

শঙ্খ সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। মৃত শামুকের খোল থেকে শাঁখারিরা শঙ্খ তৈরি করেন। শঙ্খধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি। সমাজে মঙ্গলসূচক কোন অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজানো হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ধাঁধার মাধ্যমে শঙ্খের উল্লেখ করেছেন।

"জিয়ন্ত জে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে

অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে

অবশ্য আনএ নব মঙ্গল বিধানে

হেয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভনে"। (১০৪)

মুকুন্দরাম লোকশিল্পের মাধ্যমে বাংলা ধাঁধায় রস সৃষ্টি করেছিলেন। আজ থেকে সাড়ে চারশ বছর আগে রচিত এসব ধাঁধায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানদণ্ড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধাঁধাকে কবি বিশেষভাবে সাহিত্যে শ্রীসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। মুকুন্দরাম ছিলেন পণ্ডিত কবি। তাঁর বিদ্যা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-বস্তুনিষ্ঠতা-সামাজিক চেতনা এবং রসসৃষ্টি শিল্পের আধারে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ধাঁধাকে নিয়ে যে এভাবে রসসৃষ্টি করা যায়, তা উল্লেখ করেন শীলা বসাক তাঁর 'বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন- "মনে হয় মুকুন্দরাম মৌলিক ধাঁধার ভিত্তিতেই এই সকল ধাঁধাগুলিকে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে ডিম, ধান, চোখ, পাখি, উকুন, নারকেল, মেঘ, হুঁকা ইত্যাদি বিষয়ক ধাঁধাগুলি পড়লে মনে হয় যে, বাংলাদেশের ধাঁধার সর্বযুগের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত রসসৃষ্টি একদিন কবিকঙ্কণের লেখনীতে প্রায় চারশ বছর আগেই সম্ভব হয়েছিল"। [১০৫]

রায়বেঁশে নৃত্য ও লোকশিল্প : কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন রায়বেঁশে নৃল্যকলার পরিচয় আছে। রায়বেঁশে প্রাচীন যুদ্ধ নৃত্য। বীররসের সঞ্চার আছে নৃত্যে। ডোম জাতি বীরের জাতি। মধ্যযুগে পদাতিক ডোম সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রার সময়ে এই নৃত্য করতেন। পদাতিক সৈন্যরা পাইক নামে চিহ্নিত। রায়বেঁশে নৃত্য বাংলার গৌরবময় সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। নৃত্য সম্পর্কে ধারণা এই যে, নৃত্যে মেয়েদের অধিকার একচেটিয়া। কিন্তু প্রাচীন বাংলার ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত তরুণেরা এমন প্রাণচঞ্চল, উদ্দাম, পৌরুষ কঠোর উন্মাদনার সঞ্চার করেছিলেন এই যুদ্ধ নৃত্যে। রায়বেঁশে নৃত্যকলা সমষ্টি গত নৃত্যকলা। মধ্যযুগের বাউরি তরুণেরা খালি গায়ে মালকোঁচা করে এই নৃত্য করতেন। রণডঙ্কা ও ঢোল এই দুই বাদ্যযন্ত্র রায়বেঁশে নৃত্যের আবশ্যিক উপকরণ। গুরুসদয় দত্ত তাঁর "রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধে লিখেছেন-"সেই রণতাণ্ডব নৃত্য [যে] বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট গৌরবময় অঙ্গ ছিল"।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে কালকেতু যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি

শ্রবণে কলকলি শুনি [১০৬]

ধনপতির সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে এমন রায়বাঁশিয়া নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। কেমন ছিল এই নৃত্য? কি কি বাদ্য বাজানো হত? মুকুন্দরাম লিখেছেন-

বরঙ্গ ভেরি দোসরি মোহরি

ঘন বাজে বিরকালি

সিংহা কাড়া ঘন বাজে পড়া

শ্রাবণে লাগএ তালি।

ঘন বাজে দামা চমকিত সর্বজনা।

তবকী তবকে রোল

পাইক দেই উড়্যা পাক ঘন বাজে বিরঢাক

কেহ কার না শুনে বোল।

ডিণ্ডিম ডম্বুর পুরএ অম্বর

ঘন বাজে জয় জগঝম্ফ

ঘন জয়-সানি রণজয় যেনি

সিংহলে উঠিল কম্ফ

পাইকের কল কল ভরিল সিংহল

সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান

.....

খেলে পাইক বাঙ্গালি কান্ডাফলা বিজুলি

কেহ বিন্ধে পুতিআ বেঞ্জা

মণ্ডলি করিআ ধায় রায়বাঁশিয়া

কেহ ধায় ফিরাইয়া নেঞ্জা [১০৭]

সুদূর সিংহল দেশেও পাইকদের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ-

‘সোনার নূপুর পায় বিরঘড়্যা পাইক ধায়

রায়বাঁশ ধরে খরসান

সোনার টোপর শিরে ঘন শৃঙ্গনাদ পুরে

বাঁশে দোলে চামর নিশান।

পাইক রণে পরচণ্ড ধায় বীর কালুদন্ড,

বার শত সঙ্গে ঢোকনিঞা [১০৮]

এক প্রজন্ম পরে শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা এবং যুদ্ধ। আবারও বীরত্বের পরিচয় রেখে যাচ্ছেন পাইক সৈন্যরা। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

“মুণ্ডলি করিআ ধায় রায়বাঁশিয়া

কেহ ধায় ফিরাইআ নেঞ্জা

পাইকের কলবল ভরিল সিংহল

শিঙ্গা কাড়া টমক নিসান”। [১০৯]

বোঝা যাচ্ছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এমন রায়বাঁশিয়া নৃত্যের উত্তরাধিকার বহন করেছেন বাঙালি পাইকেরা। এক প্রজন্ম পরে সিংহলে রায়বাঁশিয়া নৃত্যের পরিচয় রেখে গেছেন কবি। কবির বর্ণনা একই রকম। শুধু দু’ একটি শব্দ এবং বানানগত ভিন্নতা ছাড়া হুবহু এক রায়বেঁশে নৃত্যশৈলী। ‘কর্ণে লাগে তালি’, ‘পাইকের কলবল’, ‘মুণ্ডলি করিআ’, ‘ধায় রায়বাঁশিআ’ প্রভৃতি ধ্বনিগত কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে মাত্র। ডোম জাতির সেই নৃত্যকলা আজ নেই। পদাতিক (পাইক) সৈন্যদের এমন উন্মাদনায় রণনৃত্যের সঙ্গে নানা শিল্পকলা বিশেষত লোকবাদ্যের ব্যবহার আছে। ‘বিরঢাক’, ‘ডম্বুর , জগঝম্প, শিঙ্গা এবং পাইক বাঙালির ‘কান্ডাফলা’ প্রভৃতি লোকবাদ্য এবং লোকশিল্পের উল্লেখ এসেছে এই নৃত্যে। ষোড়শ শতকের এক সামাজিক পটভূমিকে লোকশিল্পের

বিশেষ পরিমণ্ডলে কাব্যরূপ দিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের কবি। একালের গবেষকদের কাছে তা এক মহতী প্রাপ্তি।

সেদিন ছিল বাঙালির গৌরবের দিন। পদাতিক রায়বেঁশে যোদ্ধাদের সেই বিক্রমের কথা বলেছেন কবি-

"শ্রীমন্তে বেড়িআ ধায় রায়বাঁশিআ

পদাতিক শয়ে শয়

ভাঙিল রায়বাঁশ পদাতিকগণে ত্রাস

শ্রীমন্তের হইল জয়"। [১১০]

দেখা যাচ্ছে, নৃত্যকলার সঙ্গে নানা লোকশিল্প বিশেষত লোকবাদ্যের ব্যবহার রয়েছে। রায়বেঁশে নৃত্যে ঢোল এবং বাঁশির ব্যবহার আছে। এছাড়া ধনুক, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি লোকঅস্ত্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'রায়বেঁশে নৃত্য' প্রবন্ধে লিখেছেন-

"বাংলার জাতীয় নৃত্যের মধ্যে রায়বেঁশে নৃত্যেই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। একসময় এই নৃত্য বাংলার পদাতিক সৈন্যরা অনুশীলন করত। [...] যুদ্ধের উত্তেজনা ও মাদকতার আবহাওয়ায় এই নৃত্য পরিপূর্ণ। নৃত্যে সামরিক কুচকাওয়াজের ন্যায় বহু ভঙ্গি আছে এবং বহু ও হস্তের হাবভাব দ্বারা ধনুশ্চালনা, অসিচালনা, বর্শা নিক্ষেপ, অশ্বচালনা, রণপায়ের ভঙ্গি প্রভৃতি নির্দেশ করা হয়। [...] রায়বেঁশে নৃত্যের শেষে বহু প্রকার কসরত হয়ে থাকে। যথা-দাঁড়িপাল্লা, তালগাছ, হনুমানডন, ব্যাঙভাসা, পালট, লাঠিখেলা ইত্যাদি। রায়বেঁশে নৃত্যে ঢোল ও কাঁশির ব্যবহার অপরিহার্য। এই নৃত্যে ধুতিকে মালকোঁচা (আটোসাটো) করে লাল শালুকে ধুতির উপর বাঁধতে হয় এবং উন্মুক্ত শরীরে নৃত্যনুষ্ঠান করতে হয়"। [১১১]

মধ্যযুগে বাঙালি সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত রূপ ফুটে উঠেছিল। মধ্যযুগের বাংলাদেশের এক একটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের মধ্যে ছিল কুমোরপাড়া, কামারপাড়া, তাঁতিপাড়া। কুমোর-কামারেরা ছিলেন পরিপূর্ণ শিল্পী। গান্ধীজি, এমন এক

একটি গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কুমোরেরা মাটি দিয়ে হাঁড়ি কলসী তৈরি করতেন। কামার লোহার জিনিসপত্র, তাঁতি বুনতেন কাপড়। কবির কাব্য হয়ে উঠেছে জাতি-বৃত্তি-সম্প্রদায়ের চলমান মিছিল। আখেটিক খণ্ড আর্য অভিযানের উপাখ্যান। ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার লোকশিল্পীদের পুষ্ট করেছে। কাব্যে এসেছে নানা জাতি, ব্রাত্য মানুষের শিল্পকলা। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং কায়স্থতন্ত্রের প্রবল দাপট এবং উত্তরণের অভিঘাত সমাজনিষ্ঠ মুকুন্দের কাব্যকে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি দত্ত, কায়স্থতন্ত্রের দুই রূপ। ধনপতি বাণিজ্য বিনিময়ে পারদর্শী।

কোন মানুষ একই নদীতে দু-বার স্নান করেন না। অর্থাৎ মানুষ একই অভিজ্ঞতার প্রবাহে একাধিকবার ডুব দিতে চায় না। মুকুন্দরামও সমাজ প্রবাহ থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর, নতুন থেকে নতুনতর পথ খুঁজেছেন। বাঙালি জাতির সৃষ্টির ইতিবৃত্ত নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত এবং নির্বিকারভাবে ইতিহাস ও সমাজের আধারে মুকুন্দের কাব্যে রূপ পেয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের টেক্সট হয়ে উঠেছে ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্যের পরম্পরা। কাব্যে আছে আরণ্যক সভ্যতা ধ্বংসের স্ফুটমান ইতিবৃত্ত, এক যুগের অবসান থেকে আর এক যুগের অভ্যুত্থান। জঙ্গল কেটে প্রজাবসতির চিহ্ন আছে কাব্যে। ইতিহাস সময়ের সালতামামি নয়, সেখানে আছে সমাজ, শিল্প, অর্থনীতি, যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সূচক। শিল্পের জন্মক্ষণ বিকাশ-বিবর্তন মুকুন্দের কাব্যের বড় জায়গা জুড়ে। কবিকঙ্কণের কাব্য নানা প্রতিমায় ধারণ করে আছে ব্রাত্য লোকশিল্পী, তাদের শিল্পকলা, ইতিহাস – সমাজ এবং সাহিত্যের পরম্পরাকে। A. L. Basham তাঁর "The wonder that was India" গ্রন্থে লিখেছেন – "The tendency of Indian art is diametrically opposite to that of medieval Europe. The temple towers, though tall, are solidly based on earth. [...] In our opinion the usual inspiration of Indian art is not so much a ceaseless quest for the absolute as a delight in the world as the artist found it, a sensual vitality, and a feeling of growth and movement as regular and organic as the growth of living things upon earth". [১১২]

তথ্যসূত্র

১. Childe Gordon, V., Social Evolution, Aakar books, First Indian Edition 2017, Delhi, P. 22

২. Bose, S.C. (Bose Shib Chunder), The Hindoos as they are: A description of the manners, Customs and Inner Life of Hindoo Society in Bengal, London, Edward Stanford, Calcutta, 1881, P. 165

৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,

৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার ও চৌধুরী, শ্রীবিশ্বপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃঃ ৩৭, ৩৮

৫. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, The Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P.-Xliii

৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, ও, চৌধুরী, শ্রীবিশ্বপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃঃ ১৭৬

৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৭

৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩১

৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬০

১০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭২

১১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১০

১২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩৪, ৩৫৫

১৩. Mago, Prananath, Contemporary Art In India: A Perspective, National Book Trust: New Delhi, India, 2001, P. 97

১৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, ও, চৌধুরী, শ্রীবিশ্বপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃঃ ৩৪৩, ৩৪৪

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪৫, ৩৪৬

১৬. Encyclopedia, Britannica, Folk Arts, P. 325

১৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার, ও, চৌধুরী, শ্রীবিশ্বপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃঃ ৩৩৯

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯৯

১৯. Coomaraswamy, Ananda K., History of Indian and Indonesian Art, Chapter: Dravidians and Aryans, London, Edward Goldston, 1927, Leipzig, Karl. W. Hiersamann, New York, E, WEYHE, U.S.A, P. 8

২০. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, The Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P.-207

২১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ২৭২

২২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫০

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬০

২৮. তদেব

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ: ৭২৫

৩১. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, The Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P.-71

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭২

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৩

৩৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৮২

৩৫. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, The Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P.- 72

৩৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ২৭১

৩৭. Russell, R.V., The Tribes and Castes of The central provinces of India, Vol. 1, CPSIA, www.IcGtesting.Com, USA, BVHWOIS0830231018, 530990BV0005B/41/P P. xxxii

৩৮. সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ, খেজুর-বাগান, গ্রামীণ সংস্কৃতির ঝাঁপি, প্রবাল কান্তি হাজরার গ্রন্থ থেকে কবিতাটি উদ্ধৃত, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ: ১২৮

৩৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৮৩

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪

৪১. Risley, Herbert Hope, The Tribes and Castes of Bengal, The Bengal Secretariat press, 1892, Ethnographic Glossary, Vol.1, P. 186

৪২. গুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ, আড়িয়লের কাগজ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪১, পৃ: ২৬, ২৭, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৭৯

৪৪. গুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ, আড়িয়লের কাগজ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪১, পৃ: ২৬, ২৭, সম্পা. – রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৪৪

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৬

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৩

৪৮. Russell, R.V., The Tribes and Castes of The central provinces of India, Vol. 1, CPSIA, www.IcGtesting.Com, USA, BVHWOIS0830231018, 530990BV0005B/41/P P. xxxviii

৪৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৪১

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৪

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৪

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৫

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮২

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৩

৫৮. Russell, R.V., The Tribes and Castes of The central provinces of India, Vol. 1, CPSIA, www.IcGtesting.Com, USA, BVHWOIS0830231018, 530990BV0005V/41/P, P. xxx

৫৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,

৫৯.(ক) পূর্বোক্ত, পৃ: ১২

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৪

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৩

৬৩. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), নিমাই চন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, পৃঃ ৭০৪

৬৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩,

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৮

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০২

৭১. তদেব

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭৫

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৭৬

৭৪. Wilkins, W.J., Hindu Mythology, Rupa. Co., New Delhi, 2000, P. 309

৭৫. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৪৩

৭৬. Bose, S.C. (Bose Shib Chunder), The Hindoos as they are : A description of the manners, Customs and Inner Life of Hindoo Society in Bengal, London, Edward Stanford, Calcutta, 1881, P. 60

৭৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ১২১

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২২

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৪

৮০. Bose, S.C. (Bose Shib Chunder), The Hindoos as they are : A description of the manners, Customs and Inner Life of Hindoo Society in Bengal, London, Edward Stanford, Calcutta, 1881, P. 44

৮১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ২৯০

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯৬

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৯

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০

৮৬. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), নিমাই চন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৭৬২

৮৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ১১১

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৫

৮৯. তদেব

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৬

৯১. সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, শ্রীহরিদাস, স্মৃতিচিন্তামণি: (সম্পা.), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫, পৃঃ ৩২০, ৩২১

৯২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৭৪

৯৩. কালিদাস, মেঘদূত, কালিদাসের মেঘদূত, রাজশেখর বসু অনূদিত, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১১, পৃ: ৫

৯৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ১৩৫

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৫

৯৬. Covell, Allan Carter, Folk art and Magic, (Shamanism in Corea). First American Edition, Hollym Corporation Publishers, 1988, New Jersey, USA, P. 28

৯৭. Harris, J.R., Egyptian Art, Spring Books, London WC_2, Paul Hamlyn Ltd., 1966, P. 25

৯৮. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৬৭

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৮

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৯, ২১০

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৪

১০২. দত্ত, রমেশচন্দ্র (সংকলিত), ঋগ্বেদ সংহিতা (মূল), নিমাই চন্দ্র পাল (সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৮৫

১০৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ১২৮

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬

১০৫. বসাক, ড. শীলা, বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ: ২৬

১০৬. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃ: ৮৯

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৭

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১২

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫২

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬৮

১১১. দত্ত, গুরুসদয়, রায়বেঁশে নৃত্য, গুরুসদয় দত্ত নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: ১১১, ১১২

১১২. Basham, A.L., The Wonder that was India, Picador, London, 2004, P. 349